হাসির অন্তরালে

[চরিত-চিত্র]

শ্রী[illegible]

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

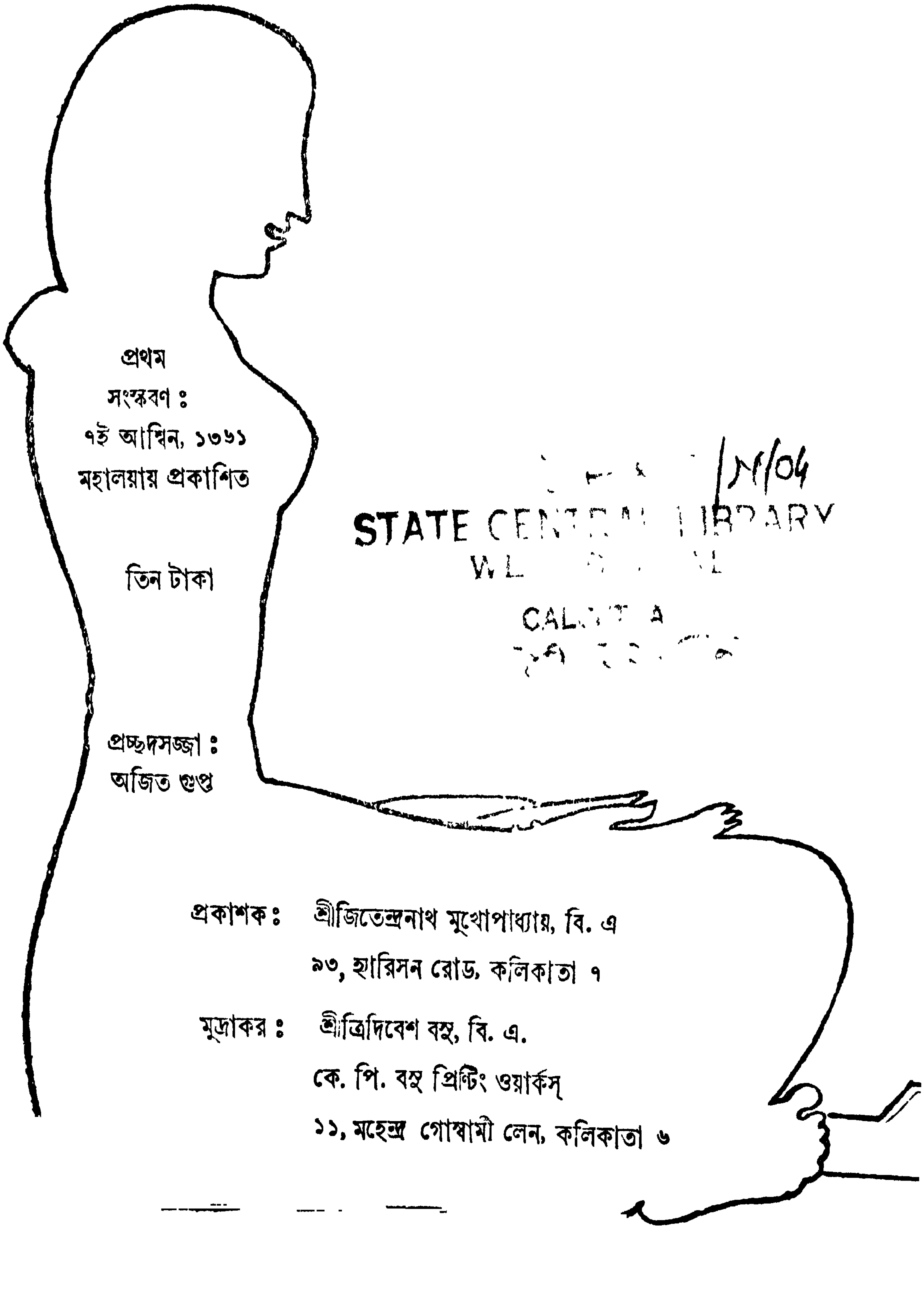

প্রথম
সংস্করণ ঃ
৭ই আশ্বিন, ১৩৬১
মহালয়ায় প্রকাশিত

তিন টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা ঃ
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক ঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ
৯৩, হারিসন রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর ঃ শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬

STATE CENTRAL LIBRARY
CALCUTTA

উৎসর্গ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

সুহৃত্তমেষু-

উপোদঘাত

'হাসির অন্তরালে' ধারাবাহিকরূপে বেরিয়েছিল রবিবাসরীয় যুগান্তরে।

নিজের কথা সাত কাহন ক'রে বলা আজকালকার ভদ্রলোকদের প্রথা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আগে এ-প্রথা অসাধারণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো। আজকাল ও-বালাই নাই;—অসাধারণেরা সাধারণের পর্যায়ে নেমেছেন আর সাধারণেরা অসাধারণের পঙ্‌ক্তিতে উপবেশন করেছেন। এই গণ্ডী ভেঙ্গে যাওয়ায় আমার মতো ব্যক্তির আত্মপ্রচারের একটু সুবিধে হয়েছে। হাসির অন্তরালে থেকে আমি এই মহাজন-পন্থারই অনুসরণ করেছি একান্ত অসঙ্কোচে এবং নিতান্ত নির্লজ্জভাবে। আমার এই ঢক্কাবাদন যদি কারও কর্ণপটহ ভেদ করে, তাহ'লে তাঁর কাছে আমি মার্জনা ভিক্ষা করছি।

ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য ও শ্রীপরিমল গোস্বামী—এই দু'জন সাহিত্যিক বন্ধু—আনুকূল্য না করলে 'হাসির অন্তরালে' ভূমিষ্ঠ হ'তো কি না সন্দেহ। এঁদের কাছে মামুলি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বন্ধুত্বের ওপর লৌকিকতার পঙ্ক-প্রলেপ দিতে আর প্রবৃত্তি হ'লো না।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী লিমিটেডের শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বড় আশায় বুক বেঁধে বইখানি প্রকাশ করলেন। তাঁর মুখে যদি হাসি ফোটে, তাহ'লেই আমি স্বস্তি পাই।

গ্রন্থকার

গুরুবাক্য লঙ্ঘন করা পাপ। এই পাপকার্যটি ক'রে কতটা লঘু হ'য়ে পড়লাম, সেই গোপন-কথাটি আজ লজ্জার মাথা খেয়ে সকলকে বলবো।

আর দশজনের মতো আমারও যৌবনারম্ভে শখ হ'য়েছিল সঙ্গীত-রাজ্যে বিচরণ করতে। দু'চারটি ধ্রুপদ, দু'চারটি খেয়াল, ডজন-খানেক টপ্পা,—এ ছাড়া যাত্রা-থিয়েটার-কীর্তন-বাউল, রামপ্রসাদ-কমলাকান্ত-নীলকণ্ঠ, গিরিশচন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত প্রভৃতি নানান্‌বর্ণী সম্ভারে আমার গানের ডালিটি সাজিয়ে আরও কিছু সম্পদ সংগ্রহ করবার জন্যে একদা এলাম শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত-রসে যে একেবারেই বঞ্চিত ছিলাম, এমন নয়। কিন্তু তা অতি সামান্য। শান্তিনিকেতনে সুররসিক দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে গান শিখতে লাগলাম। তাঁর সঙ্গে 'দিন্‌-দা' সম্পর্ক স্থাপন করতে বড় বেশি বিলম্ব হ'লো না। বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে তিনি রবীন্দ্র-সঙ্গীত শেখাতে লাগলেন। প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কলকাতা থেকে রওনা হই, আর পরের সোমবার সকালবেলায় শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় ফিরি; মাস দুই যাতায়াতের পরে একদিন রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'তুমি এ-ভাবে কষ্ট ক'রে প্রতি সপ্তাহে যাওয়া-আসা করছো কেন? এখানে, বেশিদিন নয়, বছরখানেক থেকে শ'-পাঁচেক গান শিখে নাও। রাজি থাকো তো বলো, আমি তার ব্যবস্থা করি।'

আমি সবিস্ময়ে বললাম, 'পাঁচশো! অত গান শিখে আমি কী ক'রবো?'

কবিগুরু বললেন, 'কেন, ছাত্রছাত্রীদের শেখাবে, গান দিয়ে পয়সা রোজগার করবে?'

সঙ্গে সঙ্গে আমি উত্তর দিলাম, 'আজ্ঞে, ওটি আমি পারবো না,—গান বিক্রী ক'রে পয়সা রোজগার করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।'

কবি বললেন, 'কেন হে, তোমার মনে এ অস্বাভাবিক কৌলীন্য জাগলো কেন বলো তো? ডাক্তারী শিখে ডাক্তারে পয়সা রোজগার করে, ওকালতী ক'রে উকিলরা পয়সা রোজগার করে; গাইয়ে গান শিখিয়ে পয়সা রোজগার করবে, এতে আপত্তির কারণটা কোথায় আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি নে।'

সবিনয়ে বললাম, 'আসলে আমার মন চায় না গানের পেশা অবলম্বন করতে। ও-কার্য আমার দ্বারা হবে না।'

গুরুদেব চুপ ক'রে রইলেন। অলক্ষ্মী দেবী বোধহয় সে-দিন অলক্ষ্যে ক্রূর হাসি হেসেছিলেন।

* * *

এ আজ প্রায় বত্রিশ বৎসর আগেকার কথা। আমি একাধারে সাংবাদিক ও সঙ্গীত-শিল্পী। সাংবাদিকতাই উপজীবিকা; গান গাই মনের আনন্দে। আমার কণ্ঠস্বরে কোকিলের কূজন ছিল না, কিন্তু জলদের নির্ঘোষ ছিল—একেবারে দ্বাদশ-অশ্বশক্তিসম্পন্ন হ্রেষা-রব। শ্রোতাদের কর্ণপটহ-বিদারী কণ্ঠস্বরের জন্যই বোধহয় জনবহুল সভা-সমিতি প্রভৃতিতে আমার ডাক পড়তো। সে-কালে তো এখনকার মতো 'মায়িক' ছিল না, তখনকার গাইয়েরা সকলেই 'অ-মায়িক' অবস্থায় আসরে গান গাইতেন।

গান গেয়ে বাহবা পাওয়াটাই তখন ছিল একমাত্র কাম্য। কিন্তু

এই বাহবার সম্যক স্বাদের পরিচয় পেতে আমার দীর্ঘদিন লেগেছিল। বাহবাটা যে একেবারেই আলুনী, সেটা আস্বাদন করলাম অনেক দিন পরে। একটি দিনের কথা বলি ঃ

একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু এসে একদিন অনুরোধ করলেন, কলকাতার দক্ষিণ-প্রান্তে—সাহানগরে—তাঁর এক আত্মীয়-বাড়ীতে গাইতে যেতে হবে। যথানির্দিষ্ট দিনে আমার সেদিনকার সম্বল একটি মাত্র টাকা পকেটে নিয়ে বৌবাজার থেকে ট্রামে উঠলাম। সন্ধ্যার পরে সাহানগর অঞ্চলে পোঁছে বহু চেষ্টার পর আমার গন্তব্যস্থলটি মিললো। দেখি, আসর ভর্তি। সকলেই আমার অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হ'য়ে ব'সে আছেন। অবিলম্বে গান আরম্ভ করলাম। গানের পর গান—জমজমাট আসর। শ্রোতারাও বেশ সমঝদার ;—ঠিক ঠিক জায়গাটিতে বাহবা দিয়ে তাঁরা যত রসবোধের পরিচয় দিচ্ছেন, তারিফের তপ্ত ভিয়েনে আমি ততই তেতে উঠছি। বোধহয় তিন ঘণ্টা গাইলাম। কীর্তন শুনে শ্রোতাদের ভক্তি-সরস নেত্রে যেমন অশ্রুবর্ষণ হ'লো, সর্বশেষে হাসির গান শুনে আসরময় ছড়িয়ে পড়লো তাঁদের দন্তরুচিকৌমুদী। আসর ভাঙলো রাত এগারোটার পরে। ঐ আসরেরই দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তি আমার সঙ্গে-সঙ্গে এলেন ট্রাম-লাইন পর্যন্ত। অত রাত্রিতে উত্তর কলিকাতাভিমুখী কোনও ট্রাম নাই। ভদ্রলোক দুটি আমার গানের তারিফ করছেন তখনও। তাঁদের একজন বললেন, 'নলিনীবাবু, আপনি একটি জীনিয়াস।'

তাঁর কথাটি শেষ হ'তে-না-হ'তে অপর ভদ্রলোকটি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এই ট্যাক্সি!' অদূরে একখানি ট্যাক্সি পথ দিয়ে যাচ্ছিল। ভদ্রলোক ডাকা মাত্র ট্যাক্সি দাঁড়ালো আমাদের গা ঘেঁষে। ট্যাক্সি-চালক দরজা খুলে দিলে, আমিও ভিতরে গিয়ে আসন গ্রহণ করলাম।

ভদ্রলোক দু'টি আবার 'সত্যি আপনি জীনিয়াস' ব'লে বিদায় নিলেন।

ট্যাক্সি চলেছে তখন রসারোড দিয়ে, কি আমার হৃৎপিণ্ডের ওপর দিয়ে বুঝতে পাচ্ছিনে। জীনিয়াসের পকেটে তখন পুরো একটি টাকাও নাই, ঘরের ভাঁড়েও একমাত্র মা-ভবানী বিরাজ করছেন। যেতে হবে কালীঘাট থেকে বৌবাজার! উপায় কি, একমাইল পুরো চলবার পূর্বেই নেমে প'ড়ে আট আনা আক্কেল-সেলামি দিয়ে ট্যাক্সি-চালককে বিদায় করলাম। তারপর সেই রাত-দুপুরে ভবানীপুর থেকে বৌবাজার—পদব্রজে জীনিয়াসের জয়যাত্রা!

বাড়ীতে ব'লে এসেছিলাম—রাত্রিতে খাব না, কারণ ভোজন-পর্বটা

সাহানগরেই সেরে আসবো আশা করেছিলাম। কিন্তু আহার চুলোয় যাক, রাহাখরচটাও দিলে না সাহানগরের নাগরিকরা। কেবল 'জীনিয়াস' শুনিয়েই পেট ভরিয়ে দিলে!

তারপরে সহসা এমন একটি দিন এল যখন আমার জীবন-শকটের তৈল-তৃষ্ণার্ত চক্র-দু'টি কাতরোক্তি করতে-করতে একটি দুর্গম স্থানে এসে ভগ্নপ্রবণ অবস্থায় দাঁড়ালো অচল অবস্থা সৃজন ক'রে! বন্ধুবর দিলীপকুমার রায় হাসির গানকে পেশারূপে গ্রহণ করতে পরামর্শ দিলেন। তখন হাসির গানের গায়কও কলকাতা শহরে বড় বেশী ছিল না। প্রতিযোগী খুবই কম। দিলীপের পরামর্শটা উড়িয়ে দেবার মতো সামর্থ্য তখন আমার নাই। গ্রহণ করলাম বন্ধুর পরামর্শ। কল্পনা-নেত্রে দেখতে পেলাম, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে স্মিতহাস্যে যেন আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন!

বিধির বিধান অবনতমস্তকে মানতে হ'লো। গান-শেখানো আর গান-গাওয়া—এই দু-ধারী তলোয়ার চালিয়ে আমার দুর্দিনগুলি কর্তন করবো সিদ্ধান্ত করলাম। দরজা খুলে ব'সে রইলাম খদ্দেরের আশায়।

সকালবেলা। বৈঠকখানায় ব'সে আছি। একটি তরুণ এলো আমার কাছে। এসেই বললো, 'দিলীপকুমার রায়ের কাছ থেকে আসছি।'

'কি ব্যাপার?'

'আমাদের কলেজের বাৎসরিক অধিবেশন। সেখানে একটু গান-বাজনার আয়োজন করছি। দিলীপবাবুর কাছে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে পাঠিয়ে দিলেন আপনার কাছে। আপনাকেও যেতে

হবে অমুক দিন সন্ধ্যায় করিন্থিয়ান রঙ্গমঞ্চে। সেইখানেই আমাদের জলসা। দিলীপবাবুর কাছে শুনলাম, আপনি নাকি প্রফেসন্যাল হয়েছেন, স্যার? ফী কত করলেন?'

ফী একটা ঠিক করেছিলাম: সাধারণ গানের আসরে কুড়ি টাকা, ছাত্রদের জন্যে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা—কনসেসন রেট—কিন্তু দশ টাকার কম নয়। এ সবই ছিল আমার মনের মধ্যে। আজ পর্যন্ত মুখ দিয়ে ফী-এর কথা উচ্চারণ করবার কারণ ঘটেনি। কি জানি কেন, ছাত্রটির কাছে টাকার কথাটা কিছুতেই পাড়তে পারলাম না—কে যেন কণ্ঠ রোধ ক'রে দিতে লাগলো ভেতর থেকে। নিতান্ত সঙ্কোচের সঙ্গে বললাম, 'যা হয় দিয়ো।'

ছেলেটি বললে, 'পঁচিশ টাকা? পঁচিশ টাকা দিলে অন্যায় হবে না তো?'

অন্যায়! দশ টাকা বললেও অন্যায় হ'তো না। বললাম, 'অন্যায় কি! পঁচিশ টাকাই দিয়ো ভাই।'

মুখ ফুটে আর সত্যকার অঙ্কের কথাটা উত্থাপন করতে পারলাম না। ছেলেটি চ'লে গেল। ব'সে ব'সে ভাবছি, নিজে হ'তে বললে পঁচিশ টাকা! আহা, বড় ভালো ছেলে! এরাই তো ভবিষ্যৎ-ভারতের নেতা। স্বাধীন ভারত তো এরাই চালাবে। ছেলেটিকে দেখে ভরসায় বুক ভ'রে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা চিন্তা মনে এল,—আমার পেশাদার গায়ক-জীবনের শুভযাত্রার কথা। এই প্রথম আহ্বানের পরম ক্ষণটি আমার প্রাণে বিপুল আশার সঞ্চার করলো।

ঠিক দিনটিতে যথাসময়ে উপস্থিত হলাম করিন্থিয়ান রঙ্গমঞ্চে। সেই তরুণ ছাত্রটি আমাকে নিয়ে গিয়ে অধ্যাপকদের সঙ্গে পরিচয়

করিয়ে দিলে। অবিলম্বে ট্রেতে ক'রে সাজিয়ে নিয়ে এল চা, বিস্কুট, কেক। খাসা ছেলেটি!

অনুষ্ঠান আরম্ভ হবার নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল। ছাত্রদের ও অধ্যাপকমণ্ডলীর চঞ্চল গতিবিধি দেখে মনে হচ্ছে, ভেতরে বোধহয় কিছু গোল বেধেছে। খোঁজ নিয়ে জানলাম,—যে-কলেজের এই অনুষ্ঠান, তাতে বাঙালী ও অ-বাঙালী দুই শ্রেণীর ছাত্র পড়ে। বাঙালী ছাত্রদের জন্যে ব্যবস্থা করা হয়েছে দিলীপকুমার ও আমার গান; আর অ-বাঙালী ছেলেদের জন্যে উর্দু থিয়েটার। কলেজের ছাত্ররাই অভিনয় করবে। কোন্ অনুষ্ঠানটির অধিবেশন গোড়ায় হবে, এই সমস্যা নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা চলেছে। থিয়েটারওয়ালারা 'লড়কে লেঙ্গে' ভাব দেখিয়ে পাঁয়তারা ক'যে জিগির তুলেছে শুরুতেই তাদের থিয়েটার হওয়া চাই। বাঙালীদের অল্পক্ষণের আসর। এদের যুক্তি এই যে, বাংলা প্রোগ্রাম ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই শেষ হ'য়ে যাবে, সুতরাং বাংলা আসরই আগে হোক। কিন্তু উর্দুওয়ালাদের সোরগোল-তরঙ্গিত উক্তির মধ্যে বাঙালীদের ক্ষীণ কণ্ঠের যুক্তি বুদ্বুদের মতো হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। শেষে কয়েকজন অধ্যাপক একত্র হ'য়ে মীমাংসা ক'রে দিলেন যে, থিয়েটারই আগে আরম্ভ হোক। নাটকের প্রথম অঙ্কের অভিনয় শেষ হ'লে বাংলা গানের আসর বসবে। বাংলা গানের জন্য সময় নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়া হ'লো মাত্র এক ঘণ্টা। বাংলা গানের আসর ভাঙলে আবার থিয়েটার আরম্ভ হবে দ্বিতীয় অঙ্ক থেকে।

দিলীপকুমার অনিবার্য কারণবশতঃ আসতে পারলেন না—সবে-ধন-নীলমণি আমি। থিয়েটারওয়ালারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো মাত্র একজনের গান হবে শুনে। থিয়েটার আরম্ভ হ'লো। প্রথম অঙ্কের

শেষে একটি বাঙালী ছাত্র আমাকে ডেকে নিয়ে গেল স্টেজের ওপর জিজ্ঞাসা করলাম, 'কতক্ষণ গাইবো ?'

'ছু'তিনখানা গাইবেন যতক্ষণ লাগে—'

এ-কথা শুনতে পেয়ে থিয়েটারওয়ালারা আরও খুশী হ'লো। তিনটি হাসির গান গাইতে আর কত সময় লাগবে ?—বড় জোর

আধ ঘণ্টা। গান আরম্ভ করলাম। প্রেক্ষাগৃহে বাঙালী ছাত্রেরা আর তাদের অভিভাবক ও অধ্যাপক মহাশয়রা গান শুনছেন আর নানা-প্রকার হর্ষধ্বনি দ্বারা আমাকে উৎসাহিত করছেন। পর পর দুটি গান গাইতে কুড়ি-পঁচিশ মিনিট সময় অতিবাহিত হ'য়ে গেল। দ্বিতীয় গানটি যেই শেষ হয়েছে অমনি অনেকগুলি শ্রোতৃকণ্ঠে একসঙ্গে উচ্চারিত হ'লো, 'আর একটা—আর একটা—'

শ্রোতৃবৃন্দের অনুরোধে তৃতীয় গানটি আরম্ভ করলাম। গানটির দু'চার চরণ গেয়েছি, অকস্মাৎ উইংস-এর পাশ থেকে চাপা গলায় একটি কর্কশকণ্ঠে ধ্বনিত হ'য়ে উঠলো, 'আরে, রহনে দিজিয়ে।'

তবু গান গেয়ে চলেছি। আবার 'রহনে দিজিয়ে',—এবারে অতটা চাপা গলায় নয়। কিন্তু কি ক'রে এখন 'রহনে দিজিয়ে' হয় বাবা! গানটির আধখানাও যে গাওয়া হয়নি! তবু চেষ্টা করতে লাগলাম যত শিগগির গানটি শেষ করতে পারি। কিন্তু শেষ করতে আর হ'লো না। বারংবার 'রহনে দিজিয়ে' ধ্বনিতে আমার আক্কেল-সঞ্চার হ'লো না দেখে, তারা ড্রপসিনটা দুম ক'রে ফেলে দিলে আমার সম্মুখে ;—ইঞ্চিখানেকের জন্যে হারমোনিয়মটি বেঁচে গেল। আমার ফাঁড়া কাটলো কিনা তখনও বুঝতে পারিনি।

দারুণ হট্টগোল। হাঙ্গামা বেধে গেল বাঙালী আর অ-বাঙালীতে, —দাঙ্গা বাধার উপক্রম। এরা বলে, 'কেন আমাদের গান বন্ধ করলি?' ওরা বলে, 'তোদের গানই সারারাত চলুক আর মুখে রঙচঙ মেখে আমরা ব'সে ব'সে ভেরেণ্ডা ভাজি।'

আমি গুটি-গুটি স্টেজ থেকে নেমে কোনোপ্রকারে আত্মরক্ষা ক'রে এগিয়ে চলেছি, এমন সময় সেই ছেলেটির সঙ্গে দেখা,—সেই মহাপ্রাণ উদার ছেলেটি। সে দারুণ উত্তেজিত হ'য়ে অ-বাঙালী

বন্ধুদের উদ্দেশে মধুর-সম্পর্ক-ব্যঞ্জক কতকগুলি বাক্য বর্ষণ ক'রে সবিনয় সম্ভাষণে আমাকে বললে, 'আপনি কিছু মনে করবেন না, স্যার!'

আমি যে একেবারেই কিছু মনে করিনি, তা নয়। তবু ভদ্রতার খাতিরে বলতে হ'লো যে, আমার মনের কোণেও এ-ব্যাপারটির কিছুমাত্র রেখাপাত করেনি। এখন এই দাঙ্গাহাঙ্গামার কুৎসিত পরিবেশ থেকে পরিত্রাণ পেলে আমি বাঁচি। তাই ছেলেটিকে বললাম, 'এখন শিগগির-শিগগির আমাকে বিদেয় ক'রে দাও ভাই!'

বিদেয় ক'রে দাও মানে—টাকা পঁচিশটি দাও। বুদ্ধিমান ছেলে মানেটা বুঝলে। সে 'সোহাগে মৃণাল-ভুজে' আমার গলাটি জড়িয়ে ধ'রে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল ধর্মতলা স্ট্রীটের ফুটপাথের ওপর। তারপর বাঁ হাত দিয়ে আমার ডান হাতের মণিবন্ধটি চেপে ধ'রে তার ডান হাতটি পুরলো নিজের পকেটের মধ্যে। পকেটস্থ হাতখানি অবিলম্বে বার করলে। তারপর সেই হাতখানি মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় রাখলে আমার দক্ষিণ করতলের ওপর; রেখে নিজের করপুট দিয়ে ঢাকা দিয়ে বললে, 'এবারে এই ট্যাক্সি-ভাড়াটা নিয়ে যান দাদা, পাঁচ টাকার বেশি দিতে পারলাম না।'

বলা বাহুল্য, আমার মানসমণ্ডলে তখন দ্বিতীয় রিপুর সঞ্চার দেখা দিয়েছে। ছাত্রটিকে বললাম, 'আমি ট্যাক্সিতে আসিনি। ট্রামে এসেছি, ট্রামেই ফিরবো। আর ট্রামের ভাড়া আমার কাছে আছে।'

ছাত্রটি ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতে লাগলো, 'আপনি আমার ওপর রাগ করলেন, স্যার? কী আর করি বলুন? টিকিট-বিক্রীর টাকাগুলো পুরো আদায় হ'লে কোনো কথাই ছিল না।'

এই পর্যন্ত ব'লে সে তার ডান হাতখানি ঠিক আগের মতোই নিজের পকেটে পুরে এবং সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে বার ক'রে

আবার আমার ডান হাতের চেটোর ওপর চেপে এবং নিজের হাত দিয়ে ঢেকে ম্যাজিক-দেখানো ঢঙে বললে, 'আরও পাঁচটি টাকা দিলাম। এবারের মতো এই দশটি টাকা নিয়ে মাফ করতে হবে,—ফিউচারে খুশি ক'রে দেবো, স্যার।'

কী আর করি, টাকা দশটি পকেটে পুরে বাড়ী রওনা হলাম। ট্রামে ব'সে ভাবছি—নিজে থেকে বললে পঁচিশ টাকা দেবে, দিলে দশ টাকা। তাও সহজে দিলে না, পাঁচ টাকাতেই কাজ হাসিল করতে চেয়েছিল।···

বাড়ীতে এসে টাকা দশটি বার ক'রে বাক্সে তুলতে গেলাম। ওমা, দশ টাকা কোথায়? —ন' টাকা! সত্যিই ম্যাজিক দেখালো সে। ছেলেটির নাম জানা থাকলে এখন দেখতাম ভবিষ্যৎ-ভারতে সে কোন্ পদে অভিষিক্ত হয়েছে।

কলকাতায় একজন ভদ্রলোকের অদ্ভুত দক্ষতা ছিল নানারকম উপায় উদ্ভাবনের দ্বারা অর্থোপার্জন করবার। এ বিষয়ে সত্যই তিনি একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। সাহিত্যিক না হ'য়েও তিনি সাহিত্যের এমন একটি জাল পেতেছিলেন যে, এক শ্রেণীর ধনী ব্যক্তি অতি সহজেই সেই জালে আবদ্ধ হ'য়ে পড়তো। বর-বধূর দাম্পত্য প্রণয়-সুখ ঘটবার পূর্বে তাদের মিলনের পাকা বন্দোবস্ত ক'রে আর্থিক সুখটি আগেই সম্ভোগ করতেন তিনি। আবার, প্রতি মাসে তিনি তাঁর নির্বাচিত স্থানে একটি ক'রে মজলিস বসাতেন। সেই মজলিসে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের জন্যে গান-বাজনা প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা থাকতো। এ ছাড়া সবিস্কুট চা-পানে আপ্যায়িত করতেন নিমন্ত্রিত অতিথিদের। প্রতি মজলিসে চল্লিশ পঞ্চাশজন লোকের সমাগম হ'তো। এই মজলিসের সভাপতিত্ব করবার জন্যে তিনি কলকাতার কোনো-একজন ধনী ব্যক্তির শরণাপন্ন হতেন,—গুণী না হ'লেও চলতো। এই সভাপতির আসনের মূল্য তিনি ধার্য করেছিলেন এককালীন একশো টাকা। সেই মজলিসের খরচের কথা ব'লে ভাবী সভাপতির কাছে তিনি একশো টাকা চাঁদা চাইতেন। লক্ষপতিদের শিকার করবার জন্যে তাঁর অব্যর্থ লক্ষ্য কখনও বিফল হ'তো না। ঐ একশো টাকার মধ্যে গুটিদশেক টাকা তিনি ব্যয় করতেন চা-বিস্কুটে, বাকী

নব্বুইটি টাকা প্রবেশ করতো তাঁর জামার ব্যাদিত-বদন পকেটের মধ্যে।

একদিন ভোরবেলায় আমার গৃহে উদয় হ'লেন ভদ্রলোকটি। মুখে কৃত্রিম সারল্যের কুটিল হাসি, চোখে সুদক্ষ শিকারীর শ্যেনদৃষ্টি, হাতে ঘন-ঘন-গাঁটওয়ালা কঞ্চির ছড়ি। আমি অভ্যর্থনা ক'রে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এত ভোরে এসেছেন, ব্যাপার কি ?'

'এত ভোরে না এলে ধরতে পারতাম কি ? কি রকম পাকড়েছি বলুন ?'

—ব'লেই বিজয়-গৌরবের হাসি হাসলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু উদ্দেশ্যটা কি ?'

তিনি বললেন, 'এবারের মজলিসের জন্যে এসেছি ভাই! এ-মাসের মজলিস আপনাকেই চালাতে হবে।'

ভ্রূকুটি ক'রে বললাম, 'সভাপতি হ'তে হবে নাকি ?'

আবার হাসলেন ভদ্রলোক। এবারের হাসিটি বুদ্ধিমানের হাসি। তিনি বললেন, 'সভাপতি হবার জন্যে আপনার কাছে আসবো কেন ? সভাপতির জন্যে আর ভাবনা কি ? হাজার হাজার বড়লোক আছে, যারা সভাপতি হ'তে পেলে বর্তে যায়। মাসে একটি ক'রে আমার দরকার। পঞ্চাশ বছরেও ফুরোবে না,—আমার পুত্র-পৌত্রেরা তাদের পুত্র-পৌত্রদের পাকড়াবে। আপনার কাছে এসেছি অন্য প্রয়োজনে। গানের ভারটা এবারে আপনাকে নিতে হবে। ঘণ্টা দুয়েকের মজলিস। চায়ে চ'লে যাবে আধ ঘণ্টা, বাকী দেড় ঘণ্টা আপনাকে চালিয়ে দিতে হবে।'

আমি কোনোরূপ দ্বিধা বা সঙ্কোচ না ক'রেই বললাম, 'আমাকে টাকা দিতে হবে কিন্তু—বেশি নয়, কুড়িটি টাকা।'

ভদ্রলোক যেন আকাশ থেকে ঠিকরে পড়লেন। বললেন, 'কি বলছেন! টাকা? আমার কাছে আপনি টাকা চাইতে পারলেন?'

মনের আসল ভাবটা চেপে তাঁকে বললাম, 'কি করি, দাদা, অভাবে স্বভাব নষ্ট। তা নৈলে কি গান গেয়ে টাকা নিতে হয়?'

'গান গেয়ে টাকা নেবেন না কেন? খুব নেবেন। লোকে গান শুনবে ফাঁকি দিয়ে? আলবৎ টাকা নেবেন। কিন্তু তাই ব'লে কি সব জায়গায় টাকা চাওয়া চলে, না, চাইলেই পাওয়া যায়? স্থান-কাল-পাত্র ব'লে একটা কথা আছে তো। ধরুন আপনার, বিয়ের বাসর-ঘরে গাইতে হ'লে কি আপনি টাকা চাইতে পারতেন?'

ব'লেই একেবারে হো-হো ক'রে অট্টহাসি। তবু আমি আমার কাঁদুনী সুর ছাড়লাম না—'কি করি দাদা, সাধে কি আপনার মতো বন্ধুর কাছে টাকার কথা উত্থাপন করতে হয়?'

এবার তিনি গুরুগম্ভীর ভাব ধারণ ক'রে আমাকে বললেন, 'দেখুন, টাকার দরকার হয় সকলেরই; কিন্তু সকলের ভাগ্যে নাকি টাকা জোটে না। ভাগ্য-টাগ্য ও-সব বাজে কথা। আসল কথা হচ্ছে, টাকা নিতে জানার মতো বুদ্ধি থাকা চাই। যাদের সে-বুদ্ধি নেই, তাদের দুখ্যু কখনো ঘোচে না। আমার বিদ্যে নেই, কিন্তু বুদ্ধি আছে। বুদ্ধিটে আছে ব'লেই দু'পয়সার মুখ দেখতে পাচ্ছি। আপনি আমার বুদ্ধি একটু নেবেন?'

'বেশ তো, বলুন না কি বলবেন।'

তিনি বেশ বিচক্ষণ পণ্ডিতের মতো বলতে লাগলেন, 'আমার আপিস-বাড়ী আপনি জানেন তো? আপিস আমার প্রতি শনিবারে দুটোয় বন্ধ হ'য়ে যায়। রবিবার তো পুরো ছুটি। আপনি ঐ দুটি দিন বিকেলবেলায় আমার আপিস-বাড়ীতে গানের ইস্কুল করুন।'

আমি তাঁকে আর বেশী বকতে দিলাম না। বললাম, 'গানের ইস্কুল করা সহজ কথা নয়, ইস্কুল খোলার আগে অন্ততঃ শ'দেড়েক টাকা হাতে নিয়ে কাজে নামতে হয়। বসবার জায়গা, হারমোনিয়ম, তব্‌লা-বাঁয়া,—আরও অনেক কিছুতে গোড়াতেই টাকা খরচ করতে হবে,—সে-টাকা কোথায় মশায় ?'

ভদ্রলোক আমার ওপর বিরক্ত হ'য়ে বললেন, 'আপনি আগে আমার কথা সবটা শুনুন। আমি অতটা আহাম্মক নই,—গানের ইস্কুল করতে হ'লে যে গোড়াতেই ওগুলো লাগে, তা একটা বালকেও জানে। দেড়শো কি বলছেন আপনি, অন্ততঃ পাঁচশো টাকা হাতে নিয়ে কাজ আরম্ভ করতে হবে। তব্‌লা আছে, তবলচীর মাইনে আছে, আসবাব-পত্র সাজ-সরঞ্জাম আছে, আমার ঘরের ভাড়া আছে, একটা ঠিকে চাকর থাকবে—তার মাইনে আছে, মেয়েদের জন্যে হয়তো ঠিকে গাড়ীরও ব্যবস্থা করতে হবে,—এ-সবের জন্যে দু'শো টাকা খরচ ধ'রে রাখতে হবে প্রথম মাসের গোড়ায়। টাকার জন্যে আপনি ভাববেন না। আপনার ইস্কুলের দশটি পেট্রন আমি যোগাড় ক'রে দেবো। এদের কাছ থেকে এককালীন চাঁদা নেবো পঞ্চাশ টাকা ক'রে। আপনি আমার সঙ্গে একটু ঘুরুন। দেখবেন, পাঁচ দিনে পাঁচশো টাকা যোগাড় হ'য়ে যাবে।'

আমি বললাম, 'কিন্তু দু'তিন মাসের মধ্যে যদি তেমন ছাত্রছাত্রী ভর্তি না হয়। পাঁচশো টাকা পুঁজি ভেঙে আর কতদিন চলবে ?'

ভদ্রলোক আরও বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, নলিনীবাবু, আপনি বড় বোকা। দু'তিন মাস কেন, ছাত্রছাত্রী ভর্তি হচ্ছে কিনা, প্রথম মাসেই তো বুঝতে পারবেন। যদি দেখেন

তেমন-তেমন অবস্থা, ছাত্রছাত্রী ভর্তি হচ্ছে না, তাহ'লে—দ্বিতীয় মাসের গোড়াতেই ইস্কুল তুলে দেবেন।'

'বলেন কি?'

'তুলে না দিয়ে কি আর করবেন বলুন? ছাত্রছাত্রী না থাকলে কা'কে নিয়ে ইস্কুল করবেন? দ্বিতীয় মাসের গোড়াতেই ইস্কুল তুলে দিলে খরচ-খরচা বাদ দিয়ে তিনশো টাকা আপনার হাতে থাকবে। তবু তো পেলেন তিনশো টাকা। এ বাজারে তাই বা কে ছ্যায়?'

আমি শেষ সিদ্ধান্ত শুনে হাঁ ক'রে চেয়ে রইলাম বোকার মতোই। ইস্কুল করতে রাজি হলাম না বটে, কিন্তু কনসালটেশন-ফী স্বরূপ তাঁর মজলিসে বিনামূল্যে গান গাইয়ে নিলেন তিনি।

আমার একটি দরদী বন্ধু ছিলেন সেকালে। সেকালকার

সাহিত্যিকদের অনেকেরই পরম সুহৃদ। তিনি প্রায়ই এখান-ওখান থেকে আমার গানের বায়না যোগাড় ক'রে দিতেন সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে।

একদিন দুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়া সেরে সবে বিশ্রাম করতে যাচ্ছি, এমন সময় বন্ধুবরের আবির্ভাব। বন্ধুবর সুসংবাদ দিলেন, আমাকে এক্ষুনি তাঁর সঙ্গে বেরোতে হবে,—ভালো বায়না, মোটা টাকা। কোথায় যেতে হবে, বন্ধুটি কিছুতেই কবুল করলেন না। আমি একান্ত অনুগতের মতো তাঁর অনুসরণ ক'রে চলতে লাগলাম। বন্ধুবর সটান শিয়ালদহ স্টেশনে গিয়ে দু'খানি টিকেট কিনলেন বেলঘরিয়ার। ট্রেনে চ'ড়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বেলঘরিয়ায়? ব্যাপার কি?'

বন্ধু একটু মুচকি হাসি হেসে বললেন, 'চলোই না—আর, কতক্ষণই বা।'

বেলঘরিয়া স্টেশনে নেমে বন্ধুর সঙ্গে পদব্রজে চলেছি অজ্ঞাত আসরে গান গাইতে। মনে সত্যই একটা অস্বস্তি খেলছে, কোথায় নিয়ে চলেছে? কিছুদূরে গিয়ে বন্ধু আমার থামলেন একটি বাগান-বাড়ীর দরজার সম্মুখে। প্রকাণ্ড ফটক—প্রকাণ্ড দরজা—একটা হাতী অনায়াসে গ'লে যেতে পারে। দরজাটি ভেতর থেকে বন্ধ। বন্ধুবর দরজায় ঘা দিতে-দিতে কি-একটা নাম ধ'রে উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে লাগলেন। দরজা খুলে গেল;—দেখি, একজন প্রবীণ ব্যক্তি, বয়স আন্দাজ ষাট-পঁয়ষট্টি, পরনে লুঙ্গি, খালি গা,—সামনে দাঁড়িয়ে। দরজা খোলার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর মুখের অর্গলও খুলে গেল; আমাদের দেখে তিনি অনর্গল বকতে শুরু করলেন। আমাকে দেখামাত্র জড়িত স্বরে বন্ধুটির উদ্দেশে বলতে লাগলেন, 'এই যে মাইরি, নলিনীবাবুকে নিয়ে এসেছ!' ব'লে সাষ্টাঙ্গ-প্রণত হয়ে আমার পা-দুটি জড়িয়ে ধ'রে বললেন, 'কী সৌভাগ্য আমার!'

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়! এ কোথায় এলাম? বন্ধুটি আমার অবস্থা দেখে বেশ উপভোগের হাসি হাসছেন। আমি নিজেই স'রে গিয়ে আমার বাবার বয়সী এই বৃদ্ধের হাত থেকে পা-ছুটি ছাড়িয়ে নিলাম। দাঁড়িয়ে উঠে আমাদের ছুই বন্ধুর ছুই স্কন্ধে তাঁর ছুটি হাত রেখে কোনোক্রমে ভারসাম্য রক্ষা ক'রে তিনি চলতে লাগলেন। বন্ধুবরের কাছে শুনলাম, ইনিই এই বাগানবাড়ীর মালিক এবং আজকের আসরের আহ্বায়ক।

মনটা দমে গেল। এর আগে এইজাতীয় বাগানবাড়ী সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। বাগানবাড়ীর মহামান্য মালিক উগ্র সুরা-সুরভি বিলিয়ে অসংযত রসনায় অসম্বদ্ধ প্রলাপ বকতে-বকতে, অনিয়ন্ত্রিত পদক্ষেপে আমাদের নিয়ে এসে দাঁড়ালেন একটি সুসজ্জিত কক্ষের সম্মুখে।

কক্ষের ভিতরে ছুটি নারী এবং পাঁচ-ছ'জন ধোপদুরস্ত ভদ্রলোক আসর জমিয়ে ব'সে আছেন। নারী ছু'টির একজনের বয়স চব্বিশ-পঁচিশ, আর একজন চল্লিশের কোঠায়। ভদ্রলোক ক'টি গৃহস্বামীরই সমবয়সী,—সকলেরই বয়স ষাট থেকে সত্তরের মধ্যে। পলিত-কেশ, গলিত-দন্ত পুরুষপুঙ্গবদের এরূপ স্খলিত-চরণ-চারণ আমার কল্পনার অতীত ছিল।

গৃহস্বামী ঘরে ঢুকেই নেশা-নিষিক্ত অভিভাষণে আমার পরিচয় জ্ঞাপন করলেন: 'এই যে ভদ্রলোকটিকে দেখছো, ইনি হচ্ছেন 'দি গ্রেট নলিনীবাবু'—ইণ্ডিয়ার ভেতরে দি বেস্ট্ সঙস্টার।'

—ব'লেই ছোট মেয়েটির দিকে তর্জনী-সঙ্কেত ক'রে আমাকে বললেন, 'আর নলিনীবাবু, এই যে মেয়েটিকে দেখছেন, ইনি ক্যালকাটার বেস্ট্ ডান্সট্রেস্।'

ভদ্রলোকের ব্যাকরণ-জ্ঞান না-থাকলেও রসজ্ঞান ছিল বেশ টনটনে। এই রসজ্ঞানের পরম পরিণতি ক্রমশঃ-প্রকাশ্য।

বেশ বুঝতে পারলাম, ওদের মতো আমিও মুজ্‌রো খাটতে এখানে এসেছি। গিয়ে বসলাম সেই আসরে। সঙ্গে সঙ্গে এল বোতল আর গেলাস। গৃহস্বামী স্বয়ং সারি সারি গেলাস সাজিয়ে প্রত্যেকটি গেলাসে পরিমাণ মতো হুইস্কী ঢেলে সোডার জল দিয়ে গেলাসগুলি পূর্ণ করলেন। তারপর একটি গেলাস আমার সুমুখে ধ'রে প্রস্তাব

করলেন পানের জন্যে। আমি সবিনয়ে অস্বীকৃতি জানালাম। ভদ্রলোক আর দ্বিরুক্তি না ক'রে সেই গেলাসটিই ধরলেন ছোট মেয়েটির

২৮৪৫

মুখের কাছে। তাঁর ঐ হাতে-ধরা অবস্থাতেই মেয়েটি গেলাস থেকে মদ্য পান করতে উদ্যত হ'লো। মেয়েটি সুরায় অধরোষ্ঠ স্পর্শ করা-মাত্র ভদ্রলোক গেলাসটি টেনে নিয়ে আবার আমার মুখের কাছে ধ'রে বললেন, 'এবার তো রিফিউজ্ করতে পারেন না!'

তাই তো, এ মহাপ্রসাদ প্রত্যাখ্যান করি কী ক'রে? রক্ষা করলেন আমার বন্ধুটি। তিনি গৃহস্বামীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস ক'রে কি যেন বললেন। কর্তা তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে কোনোক্রমে পা-ছুটি সিধে রেখে অনুতাপ-তপ্ত কণ্ঠে বক্তৃতা শুরু করলেন, 'হুইস্কী অফার করার জন্যে আমি নলিনীবাবুর কাছে এই প্রকাশ্য সভায় ক্ষমা প্রার্থনা করছি। নলিনীবাবু স্বদেশী আন্দোলনের লোক, দেশকে স্বাধীন করার জন্যে এঁরা না করেছেন কি—বোমা, রিভলভার, ডাকাতি, জেল, আন্দামান, ফাঁসি' ইত্যাদি ইত্যাদি···

কিছুতেই বক্তৃতা বন্ধ হয় না। সকলেই অনুরোধ করতে লাগলো তাঁকে বসবার জন্যে। কিন্তু তাঁর মুখে তখন একটি বুলি: 'আগে বলুন, নলিনীবাবু, ক্ষমা করেছেন!' সত্যিই মুখ ফুটে ব'লতে হ'লো, 'ক্ষমা করেছি।' শেষে পান-প্রত্যাশী এক ব্যক্তি উঠে জোর ক'রে তাঁকে বসিয়ে দিলেন। মহাসমারোহে পান-পর্ব আরম্ভ হ'লো। পান-পর্ব সাঙ্গ হ'লে শুরু হ'লো নাচ-গানের আসর। বয়স্কা মেয়েটি ধরলে গান, গানের সঙ্গে ছোটটির নাচ। কখনো বা গানের পর নাচ, নাচের পর গান চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে চলেছে বারুণী-রঙিন বৃদ্ধ শ্রোতাদের নানা ভঙ্গি সহকারে নানাপ্রকারের সরস বাহবা-ধ্বনি। প্রায় ঘণ্টাখানেক নাচ-গানের পর তাঁরা ধরলেন আমাকে গাইবার জন্যে। আমার আদৌ ইচ্ছা ছিলনা গাইতে। বন্ধুটি গৃহস্বামীর নাম ক'রে বললেন, 'তিনি আসুন, তারপর হবে।'

এত নাচ-গান চলেছে, কিন্তু আসল লোকটিই নেই। সেই মদ্যপান-পর্বের পর তিনি ঘর থেকে বেরিয়েছেন, আর ফেরেন নি।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আচম্বিতে হ'লো গৃহস্বামীর আবির্ভাব—চোখ দু'টি বড় বড়, ঘর্মাক্ত-কলেবর। হাতে একটি প্রকাণ্ড কাচের গেলাস নিয়ে হাঁসফাঁস করতে-করতে সেই ফেনশীর্ষ গেলাসটি আমার মুখের কাছে ধ'রে নিবেদন করলেন, 'অনেক কষ্টে যোগাড় করেছি, নলিনীবাবু, আপনার জন্যে। বিলিতী ব'লে আপনি হুইস্কী খেলেন না।'

দেখি, এই স্বদেশী দলের মহামান্য অতিথির জন্যে তিনি সংগ্রহ ক'রে এনেছেন এক গেলাস তাড়ি!

হাসির গান গাওয়া এক ঝকমারী ব্যাপার। বিশেষ ক'রে বিদ্রূপাত্মক হাসির গান। সে-গান সকলের ধাতে সয় না। যে সবলা নাড়ী সুস্থদেহে প্রাণশক্তি সঞ্চার করে, দুর্বলের দেহে তা-ই প্রাণঘাতিকা হ'য়ে ওঠে। যে-গান একজনের কানের ভিতর দিয়ে প্রবেশ ক'রে তার রসপিপাসু প্রাণকে আকুল ক'রে তুললো, সেই গান সেই আসরেই অপর শ্রোতার কর্ণপটহ ভেদ ক'রে তার স্পর্শকাতর মর্মস্থলটিকে দিল বিদ্ধ ক'রে। সকল শ্রেণীর শ্রোতাকে আনন্দ দেওয়া গায়কের পূর্বজন্মের সুকৃতির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

আমি যে-সব গান গাইতাম, সেগুলির মধ্যে তিনটি হাসির গান খুবই জনপ্রিয়তা লাভ ক'রেছিলঃ দাদাঠাকুর (শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত) রচিত 'কলকাতার ভুল', আমার 'পত্নী-প্রতিযোগিতা' ও 'নারী-প্রগতি।' 'কলকাতার ভুল' নিরঙ্কুশ হাসির গান। কিন্তু 'পত্নী-প্রতিযোগিতা' ও 'নারী-প্রগতি'তে কিঞ্চিৎ শল্যসম্পদ ছিল। এ গান দু'টিতে যাঁরা বিদ্ধ হতেন, তাঁরাও কিন্তু আনন্দ পেতেন। কেবল দুটি ক্ষেত্রে আমার 'নারী-প্রগতি' বদনাম কুড়িয়েছে। সেই কথাই বলি।

মফস্বলের কোনো একটি শহরে গানের জলসা। উদ্যোক্তারা টিকেট বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন এই আসরের আসনের জন্যে। কলকাতা থেকে কয়েকজন গায়ক ও একজন সম্ভ্রান্ত নৃত্যকুশলা কিশোরী গেছেন সেখানে। গায়কের দলে আমিও আছি। এই আসরের সবচেয়ে

বড় আকর্ষণ, সেই কুলবালার নৃত্য। অনুষ্ঠান-সূচীতে সর্বশেষে এই নৃত্যটির ব্যবস্থা করা হয়েছে। নৃত্যের অব্যবহিত পূর্বেই ছিল আমার গান। মাত্র দুটি গান গাইলাম আমি—প্রথমে 'পত্নী-প্রতিযোগিতা', পরে 'নারী-প্রগতি'। নারী-প্রগতি গানটির সঙ্গে আমার একালের পাঠক-পাঠিকাদের একটুখানি পরিচয় প্রয়োজন। গানটি এই ঃ

নারী-প্রগতিতে হেরি চারিভিতে
দলে দলে ছুটে তরুণী,—
কচি ও কাঁচায় নাচে ও নাচায়
ভয়ে কেঁপে ওঠে ধরণী।
(কেঁপে ওঠে)
(এদের নাচেই ধরণী কেঁপে ওঠে)
(এখন তাই-তো ভূমিকম্প বেশী—
নাচেই ধরণী কেঁপে ওঠে)

দাদামহাশয় মনোদুখে কয়—
সাধ নাই আর বাঁচিতে,
যখন সব বাধা ঠেলি অঞ্চল মেলি
দিদিমা চলিল নাচিতে।
(নাচতে গেল)
(দিদিমা যখন নাচতে গেল)
(ওরিয়েণ্টাল নাচ নাচতে গেল)
তখন রেগে কাঁই হ'য়ে হাতে লাঠি ল'য়ে
ছুটে চলে দাদামহাশয়,
জলসা-ক্ষেত্রে রক্তনেত্রে
হাজির হইয়া গরজয়।

দেখে নাচিছে সলিতা, নাচিছে পলিতা,
সরমা, সুরমা, সিতিমা।
(নাচিছে সলিতা)
(সত্ত ম্যালেরিয়া থেকে উঠে)
সবাকার হিয়া কাঁপাইয়া দিয়া
এবার উঠিল দিদিমা ॥

দিদিমা ঠমকে ঠমকে নাচে ঐ,
ওরিয়েন্ট নাচ সে যে নাচে ঐ,
তাই, এপাশে ওপাশে বেঁকে নাচে ঐ,
ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতন দুলে নাচে ঐ।

দাদামশায়ের মনে জাগে বিস্ময়—
দিদিমা যেন গো আর দিদিমাটি নয়।
ঘষামাজা রং-করা দেহখানি বেশ,
অঙ্গে কোথাও নাই কালিমার লেশ।
কে বলিবে দিদিমারে প্রবীণা বা বুড়ী,
বয়েস হ'য়েছে যেন উনিশ কি কুড়ি।
(দিদিমা যেন গো দিদিমণিটি)

তখন দর্শক খালি ছায় করতালি,
সকলে গিয়াছে মজিয়া।
এ-হেন সময় দাদামহাশয়
উঠিল আসন ত্যজিয়া।

মঞ্চের পানে চলে একটানে

ভাবে গদগদ চিত্ত—

দিদিমারে বাঁয়ে রাখিয়া দাঁড়ায়ে

ধরিল ডুয়েট্ নৃত্য।

(নাম লেখালো)

(দাদামশায়ও যে

নাম লেখালো)

(শিং ভেঙে বাছুরের দলে

দাদামশায়ও যে নাম লেখালো)···

গান শেষ ক'রে এসে আমি বসলাম প্রেক্ষাগৃহে—দর্শকমণ্ডলীর

মধ্যে। উদ্দেশ্য—নৃত্যরস আমিও উপভোগ করি। দর্শকরা সকলেই উদ্‌গ্রীব। কিন্তু যবনিকা আর ওঠে না। ক্রমেই দর্শকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবার উপক্রম হ'চ্ছে। এমন সময় একজন স্থানীয় ভদ্রলোক রঙ্গমঞ্চের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে বললেন, 'দেখুন তো কি ফ্যাসাদ বাধিয়ে দিয়ে এলেন মশায়!'—ব'লে নর্তকীটির নাম উল্লেখ ক'রে বললেন, 'উনি আপনার গান শুনে বেঁকে বসেছেন, কিছুতেই নাচতে চান না।'

ক্রমশঃ একথা এক-কান থেকে দশ-কান হ'তে হ'তে সারা প্রেক্ষা-গৃহময় ছড়িয়ে পড়লো। আমার বরাত ভালো যে, আমার বিরুদ্ধে কেউই গেলেন না। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা গেলেন রঙ্গমঞ্চের ভিতরে। বহু সাধ্যসাধনা চললো, কিন্তু নাচ আর হ'লো না।

একবার কোন কার্যোপলক্ষে দুটি বন্ধু মিলে শান্তিনিকেতনে গেছি—আমি আর সঙ্গীতশাস্ত্রী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। দুজনেরই প্রয়োজন ছিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। কথাপ্রসঙ্গে কবিগুরু আমাকে বললেন, 'ওহে, ছেলেমেয়েরা ধরেছে, তুমি ওদের একটু হাসিয়ে দিয়ে যাও।'

কবির আদেশ শিরোধার্য ক'রে সম্মত হলাম। সন্ধ্যার পরে লর্ড-সিংহ হলে গানের আসর ব'সলো। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক-মণ্ডলী ও ছাত্রছাত্রীরা সমবেত হলেন।

প্রথমে সুরেশচন্দ্রের এসরাজ-বাদন, তারপর আমার গান। আমি দুটি গান গাইবো মনে মনে ঠিক ক'রে রেখেছি—'নারী-প্রগতি' আর 'পত্নী-প্রতিযোগিতা'। সুরেশচন্দ্রের সুরের রেশ থামবার পর আমি পরম উৎসাহের সঙ্গে প্রথমেই ধরলাম 'নারী-প্রগতি'। এরকম বিশিষ্ট

আসরে গাইছি, কাজেই রস-বিকাশের জন্য আমার যতদূর সাধ্য চেষ্টার কোনও ত্রুটি নেই। কিন্তু অপর পক্ষে রস-গ্রহণের কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছিনে। 'নাচিছে সলিতা, নাচিছে পলিতা, সরমা, সুরমা, সিতিমা' চরণটি গাইবার পর শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে যেন একটু চাঞ্চল্য নজরে পড়লো। যাই হোক, আমি উৎসাহের সঙ্গেই গেয়ে চলেছি। দেখি, আমার গানের মধ্যেই মেয়েরা একে একে আসর ছেড়ে উঠে চ'লে যেতে লাগলেন, ক্রমে ছেলেরাও। অতঃপর একরূপ আবৃত্তি ক'রেই আমি গানটি শেষ করলাম। দ্বিতীয় গানটি আর গাইতে হ'লো না,—অবশ্য দু'চারজন শ্রোতা তখনও আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় গান শোনবার জন্যে তাঁদেরও কোন আগ্রহ দেখা গেল না!

একটি গান গেয়ে একবার রেডিয়োর চাকরিটি যাবার উপক্রম তো হয়েছিলই, আদালতে পর্যন্ত হাজির হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। 'অল্ ইণ্ডিয়া রেডিয়ো' হবার আগেকার ঘটনা। তখন বেতার-প্রতিষ্ঠানের নাম 'ইণ্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস'। 'বেতার জগৎ' কাগজখানির সম্পাদনার ভার আমার ওপর, এ ছাড়া বেতারের সঙ্গীত-আসরে গানও গেয়ে থাকি।

একদিন সান্ধ্য আসরে ছিল আমার হাসির গান। এই আসরে গান গাওয়ার দু'তিন দিন পরে প্রোগ্রাম-পরিচালক নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় আমাকে ডেকে পাঠালেন তাঁর ঘরে। তাঁর অফিসঘরে ঢুকতেই তিনি বললেন, 'সরকারী চাকরিটে খোয়ালেন তো?'

আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম। কেন রে বাবা, চাকরি

খোয়াবার মতো কী এমন অপরাধ করলাম? নৃপেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন, কী হয়েছে?'

নৃপেনবাবু রাগত বললেন, 'উকিলের চিঠি এসেছে, স্টেশন ডাইরেক্টরের নামে। সাহেব দারুণ চ'টে গেছে আপনার ওপর। এতক্ষণ হয়তো দিল্লীতে চিঠি লিখলে আপনাকে সরিয়ে দেবার জন্যে।'

'ব্যাপারটা কি, খুলেই বলুন না।'

নৃপেন্দ্রনাথ তেমনি বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বললেন, 'আপনি এই সরকারী প্রতিষ্ঠানে ব'সে অমুক ভদ্রলোককে কুৎসিত ভাষায় গালাগালি দিয়েছেন।'

যে-ভদ্রলোকের নাম করলেন নৃপেনবাবু, তিনি বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট গায়ক—বড়ো ওস্তাদ। যে-দিন নৃপেনবাবুর সঙ্গে এই কথা হচ্ছে, তার ছ'মাসের মধ্যেও ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ নেই। আমি নৃপেনবাবুর কথা একেবারে উড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'যান মশায়, কী বাজে ধাপ্পা দিচ্ছেন!'

নৃপেনবাবু উত্তেজিত হ'য়েই বললেন, 'দেখবেন, অন্ততঃ হাজার সাক্ষী এনে হাজির করবে আদালতে।'

—ব'লেই নৃপেনবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি গেলবারের প্রোগ্রামে কী গান গেয়েছিলেন?'

'রবীন্দ্রনাথের 'অমল ধবল পালে লেগেছে' গানটির একটি প্যারডি গেয়েছিলাম।'

'গানটি বলুন তো?'

আমি আবৃত্তি ক'রে গানটি তাঁকে শোনালাম। শুনে তিনি অভিমত প্রকাশ করলেন, 'গালাগালির আর বাকী রেখেছেন কী! গানটির একটি কপি দিন—সাহেব গানটি গবর্নমেণ্ট সলিসিটরের কাছে পাঠাবে।'

গানটি লিখে দিলাম ঃ

ভেড়ার গোয়ালে আগুন লেগেছে—
বহে পশ্চিমে হাওয়া,
শুনি নাই কভু শুনি নাই
এমন বিকট গাওয়া।
কোন্ রজকের ঘর হ'তে আসে
কোন্ রাসভের তান,
ঝালাপালা হ'লো কান।
শুনে দাদামশায়ের কলিকা হইতে
ফাটিয়া গেল যে তাওয়া।
শুনি নাই কভু শুনি নাই
এমন বিকট গাওয়া।

সর্দিতে ঝরে ঝর ঝর নাক,
ঘড়্ ঘড়্ গলা ডাকে—
দিদিমা শুনিয়া লেপ চাপা দিল
কোলের নাতিনীটাকে।
স্পেনিয়েলটাও মুখ উঁচু ক'রে
করিল যে ঘেউ ঘেউ,
বুঝি ভ্যাংচায় সেও ;
এ-পাড়ার লোক সে-দিন করিল
ও-পাড়ায় খাওয়া-দাওয়া,—
শুনি নাই কভু শুনি নাই
এমন বিকট গাওয়া।

গানের কপিটি নৃপেনবাবুর হাতে দিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ-গানে তাঁকে গালাগালি দেওয়া হয়েছে কোথায় ?'

নৃপেনবাবু বললেন, 'হ'য়ে পড়েছে। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, হ'য়ে পড়েছে। সে-দিনের ঐ আসরে ভদ্রলোকের ধ্রুপদ গান ছিল জানেন? তাঁর গানের ঠিক পরেই ছিল আপনার হাসির গান। তিনি ধ্রুপদ গান যেই শেষ করেছেন সঙ্গে সঙ্গে আপনি ধ'রে দিয়েছেন, 'ভেড়ার গোয়ালে আগুন লেগেছে বহে পশ্চিমে হাওয়া, শুনি নাই কভু শুনি নাই এমন বিকট গাওয়া।' আপনি কী মনে ক'রে গেয়েছেন, তাতে কিছু যায়-আসে না,—শ্রোতারা কিভাবে নিয়েছে, সেই কথাটাই আদালতে উঠবে। ভদ্রলোকের উকিল লিখেছেন, 'পাড়ার ছেলেরা তাঁকে দেখলেই চেঁচিয়ে গেয়ে ওঠে,—ভেড়ার গোয়ালে আগুন লেগেছে।'

এবারে সত্যিই আমাকে চিন্তিত হ'তে হ'লো। পরদিন উকিলের চিঠি, আমার গানটি আর স্টেশন ডাইরেক্টরের চিঠি—এ-সব নিয়ে আমি নিজেই গেলাম গবর্নমেণ্ট সলিসিটরের কাছে। গবর্নমেণ্ট সলিসিটর সমস্ত কাগজপত্র প'ড়ে আমাকে বললেন, 'এগুলো রেখে যান। আমিই উকিলের চিঠির জবাব দেব আর আপনাদের সাহেবকেও জানিয়ে দেব আমার অভিমত। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন,—এ একটা 'কেস'ই নয়, এতে কিস্‌সু হবে না।'

কেবল গান গাওয়াই নয়—গানের শিক্ষকতাও আরম্ভ করেছি। ঢাকুরিয়া থেকে শিবপুর পর্যন্ত আমার কর্মক্ষেত্র। এই শিক্ষকতা ব্যাপারেও বন্ধুবান্ধবরা যথেষ্ট সাহায্য করছেন। একদিন একজন বন্ধু

বললেন, তাঁর একটি আত্মীয়ের কন্যাকে গান শেখানোর জন্যে শিক্ষকের দরকার। কন্যার পিতাকে তিনি আমার কথা বলেছেন। ব'লে, সেই আত্মীয়ের নামে একখানা চিঠি লিখে আমাকে দিলেন। চিঠিখানি নিয়ে একদিন অপরাহ্ণে গেলাম সেই ভদ্রলোকের বাড়ীতে—ভবানীপুরে। ভদ্রলোকটি তাঁর বৈঠকখানাতেই ব'সে ছিলেন—বৃদ্ধ, বয়স ষাটের কোঠায়। চিঠিখানি হাতে নিয়ে তিনি আমাকে বসতে বললেন। চিঠি প'ড়ে বললেন, 'অ, আপনিই বুঝি গানের মাস্টার? তা বেশ। আপনার কথা সবই শুনেছি। কেবল আসল কথাটাই জানতে পারিনি। আপনি কিরকম নেবেন বলুন তো? আমি মশায়, স্পষ্ট কথার লোক। ওটা সব আগে চুকিয়ে রাখাই ভালো। সারা জীবন ধ'রে বিজনেস ক'রে এটা বেশ বুঝেছি, টাকার কথাটা আগে পরিষ্কার ক'রে নিতে হয়। ওটা আগে বলুন।'

ভদ্রলোকের কথা বলার ভঙ্গিটে আমার ভালো লাগলো না। তবু তাঁকে আমার ফী-এর কথাটা বললাম। ভবানীপুর অঞ্চলে যে-হারে মাসিক বেতন নিয়ে গান শেখাতাম অর্থাৎ প্রতি সপ্তাহে একদিন, দু'দিন বা তিন দিন শেখানোর যে হার ছিল, সেইটেই উল্লেখ করলাম। ভদ্রলোক মাসিক বেতনের কথা শোনামাত্র বললেন, 'সপ্তাহে এক-দিন দু'দিন—ওসব ছেড়ে দিন মশায়। মাসে মাসে মাইনে গুনে গান শিখিয়ে কোন্ কালে মেয়ে ওস্তাদ হবে, অতোদিন ধৈর্য ধ'রে থাকা চলবে না, মশায়। আর গুচ্ছের গান শেখাতেও আমি চাইনে। খান তিনেক গান শিখিয়ে দেবেন,—তার জন্যে কত নেবেন, বলুন।'

ভদ্রলোকের কথা শুনে আমি মহা চিন্তায় প'ড়ে গেলাম। এ এক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ব্যাপার। মাত্র তিনটি গান শেখাতে হবে! এই তিনটি গান শেখাতে তিন দিন লাগবে, না তিন বৎসর লাগবে—তারও

কোনো স্থিরতা নাই। ভদ্রলোককে বললাম, 'আগে মেয়েটির গলার স্বর একটু শুনি, তারপর টাকার কথাটা আপনাকে ব'লবো।'

ভদ্রলোক বললেন, 'তার গলায় সুর আছে কিনা, তার কোনো পরীক্ষে করা হয়নি, মশায়। এই সবে হপ্তাখানেক হ'লো পঞ্চাশটি টাকা খরচ ক'রে একটি হারমোনিয়ম কিনে দিয়েছি। সেইটে নিয়ে দিনরাত প্যাঁ-পোঁ করছে। গান তো তার কখনো শুনলাম না। আপনি ধ'রে নিন, তার গলায় সুর নেই।'

ভদ্রলোক সত্যিই ভাবিয়ে তুললেন। বললাম, 'আপনি অনুগ্রহ ক'রে হারমোনিয়মটি আনান, আর মেয়েটিকেও ডাকুন। আমি একটু দেখি, তার গলায় সুর কতটা আছে।'

ভদ্রলোক একটু যেন বিরক্তির সুরেই বললেন, 'ভালো বিপদে

পড়লাম মশায়। আপনাকে তো এইমাত্র বললাম, তার গলায় সুর নেই। এর থেকেই বলুন না, কত নেবেন।'

আমিও বিরক্তির সঙ্গেই ব'লে ফেললাম, 'একশো টাকা দেবেন।'

ভদ্রলোক একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'এই তো পরিষ্কার হ'য়ে গেল। একশো টাকাই নেবেন আপনি। দরাদরি করাটা পছন্দ আমি করিনে মশায়, বিশেষ আপনি যখন আমার ভাগ্নের বন্ধু।'

এই কথা ব'লে তিনি তাঁর চাকরকে ডেকে বললেন, 'নতুন হারমোনিয়মটা এনে দে, আর খুকীকে আসতে বল। বলিস মাস্টার এসেছে।'

হারমোনিয়ম এলো, সঙ্গে সঙ্গে এলো খুকিটিও। খুকি তার ডাক-নাম,—বয়স আঠারো-উনিশ হবে বোধ হয়। খুব শান্ত-প্রকৃতির মেয়েটি। জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম, সে গান জানে না। আমি হারমোনিয়মটি নিয়ে একটি পর্দা টিপে তাকে সেই সুরের সঙ্গে মিলিয়ে সুর দিতে বললাম। দেখলাম, কণ্ঠে সুর আছে। ক্রমে ক্রমে সাতটি সুরই সে কণ্ঠ দিয়ে বার করলে। আমার প্রাণে ভরসা এলো,—তিনটি গান শেখাতে বোধ হয় বড় বেশী বেগ পেতে হবে না।

ভবানীপুরে যে-কয়টি দিন আমাকে গানের শিক্ষকতার জন্যে কোথাও যেতে হয়, সেই দিনগুলিতে মেয়েটিকেও গান শিখিয়ে আসি। এইভাবে এক মাসের মধ্যে সে তিনটি রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিখে ফেললে। হারমোনিয়মে সঙ্গতও চলনসই রকমের হ'লো।

একদিন মেয়েটিকে গান শেখাচ্ছি, এমন সময় তার পিতাঠাকুর এসে আমাদের কাছে বসলেন। ব'সে যেমন সুখ্যাতি করলেন আমার, তেমনি তারিফ করলেন তাঁর মেয়ের। মেয়েটি বাড়ীতে নাকি সারাক্ষণ গানই গায়। গানে তার ভারি উৎসাহ।

আমি ভদ্রলোককে বললাম, 'আপনার মেয়েটি ভালো গাইতে পারবে। চমৎকার দরদী কণ্ঠ। বেশী দিন নয়, দেখবেন এক বৎসরের মধ্যে সে রবীন্দ্র-সঙ্গীত গেয়ে কলকাতায় নাম করবে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি ক্ষেপেছেন মশায়, বছরখানেকের মধ্যে সে কার ঘরে চ'লে যাবে, তার ঠিক আছে? ঐ তিনটি গান যা শিখলে, ওতেই কাজ চ'লে যাবে। আরে মশায়, বলবো কি, মেয়ে দেখতে যে আসে সে-ই বলে—মেয়ে গান জানে? শেষ পর্যন্ত তারা নাক সিঁটকে চ'লে যায়। গান না-জানার জন্যে কেউ কেউ আবার চার-পাঁচ হাজার দাবী করে।'

—ইত্যাদি ব'লে ভদ্রলোক আমার হাতে একখানি একশো টাকার নোট দিয়ে বললেন, 'খুব খেটে গানগুলি শিখিয়েছেন আপনি। এজন্যে আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। নিজ মুখে একশো টাকা চেয়েছিলেন ব'লে আমি একশো টাকাই দিলাম। আপনি যদি তার বেশী চাইতেন, তাতেও রাজি হতাম আমি। এটা একটা বিজনেসের ব্যাপার। সব খতিয়ে দেখলে এতে আমার লাভ বৈ লোকসান নেই। দু' একশো টাকা খরচ ক'রে যদি দু' এক হাজার টাকা পণের দাবী কমে, তবে সে খরচ ক'রবো না কেন বলুন?' হারমোনিয়মে লেগেছে পঞ্চাশ আর আপনি নিলেন একশো, মোট দেড়শো টাকা ঢাললাম মেয়ের গানের জন্যে। তিনটে গান তো শিখেছে;—ঐ তিনটি গান শুনলেই লোকে বুঝবে যে, মেয়ে আমার গাইয়ে।'

বেচারী মেয়েটি ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে তার পিতৃদেবের কথাগুলি শুনছে। তার বড়ো ইচ্ছা ছিল আরো গান শেখে। সে সাধে বিধি বাদ সাধলো, এখন হয়তো তার মাথায় ঘুরছে, কবে তার বাবা তাকে এ-বাড়ী থেকে বিদায় ক'রে দেবে।

সে কবে বিদায় হবে ভগবানই জানেন, আমি কিন্তু সেইদিনই বিদায় নিলাম।

এতো গেলো ঠিকে টিউশনী। এবার পাইকিরী টিউশনীর কথা বলি। সে এক নাটকীয় ব্যাপার! কলকাতার একটি সুপ্রসিদ্ধ ধনী-সন্তানের শখ হ'লো আমার কাছে গান শেখবার। বড়লোকের ঘরের ছেলে, বাড়ীর মালিকও তিনি; পূর্ণ যুবা—কোনো বদখেয়াল নেই বরং ধর্মে মতি আছে। তিনি একদিন তাঁর মোটর হাঁকিয়ে এলেন আমার বাড়ীতে। দু'-পাঁচ মিনিটে সব কথা শেষ ক'রে, আমাকে তাঁর গাড়ীতে তুলে নিয়ে একেবারে সটান তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। বিরাট প্রাসাদ। তাঁর একটি সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করলাম। বহু মূল্যবান আসবাবপত্রে ঘরটি সাজানো। এক কোণে একটি প্রকাণ্ড অর্গ্যান। ভদ্রজনসুলভ আদর-আপ্যায়ন ও চা-জলযোগাদির পর আমার ভাবী ছাত্র আমাকে অনুরোধ করলো গান গাইবার জন্যে। দু' তিনটি গান গেয়ে আমি তার গান শুনতে চাইলাম। অসঙ্কোচে সে অর্গ্যান বাজিয়ে গান ধরলো। অদ্ভুত অসামঞ্জস্য কণ্ঠে আর অঙ্গুলিতে। অর্গ্যানের হাত যেমন মিষ্টি, কণ্ঠস্বর কি তেমনি কর্কশ! সুর ব'লে কোনো বস্তু নেই কণ্ঠে। দারুণ চিন্তিত হ'য়ে পড়লাম গলার আওয়াজ শুনে।

গান গাওয়া শেষ ক'রে ছাত্রটি আমাকে বললো, 'যে-কয়টি গান এখন গাইলেন, ঐ গানগুলো আজ শিখিয়ে দিন স্যার।'

বলে কি, তিনটি গান এখুনি শিখিয়ে দিতে হবে! পরে ছাত্রটি আমার দুশ্চিন্তার নিরসন ক'রে দিলে। সে বললে, 'আপনি গেয়ে

যান স্যার, আমি অর্গ্যানে গানগুলো তুলে নিই। তা হ'লে আমার পক্ষে শেখা সহজ হবে। আমি ছু' দিন প্র্যাকটিস করি, আপনি পরের বারে যখন আসবেন, শুনবেন।'

তথাস্তু। যে পয়সা দিয়ে গান শিখছে, তার কথা শুনতে হবে বৈকি ? আমি এক লাইন ক'রে গাই, আর সে অর্গ্যানে সেটি বাজায়। এমনি ক'রে এক ঘণ্টার মধ্যে সে তিনটি গান দিব্যি আয়ত্ত করে নিলে!

সেদিনের মতো শিক্ষকতা শেষ ক'রে ছুটি দিন পরে আবার নির্দিষ্ট সময়ে হাজির হলাম ছাত্রের বাড়ীতে। এ-দিনেও প্রথমেই চা-জলযোগের পর্ব। জলযোগান্তে আবার ছাত্রের ফরমায়েস হ'লো গাইবার জন্যে।

আমি বললাম, 'আগে সেদিনের গান তিনটিই তুমি শোনাও।'

'সে হবে'খন—আপনি গান স্যার।'

কী আর করি, এদিনেও গাইতে হ'লো। গাইলাম ছাত্রের অনুরোধ মতো রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি জনপ্রিয় গান। এর পরে ছাত্র শোনালো সেদিনের গান তিনটি। কণ্ঠে সুর আদৌ বসেনি অথচ অর্গ্যানে বাজালে নিখুঁত। এবারে আমি তাকে মুখ ফুটে ব'লেই ফেললাম, 'তুমি একটু একটু ক'রে গলা সাধো, স্বর-সাধনার প্রণালী আমি লিখে দিয়ে যাচ্ছি। রোজ অন্ততঃ আধ ঘণ্টা ক'রে গলা সাধো। কণ্ঠে সুরটা একটু বসুক।'

ছাত্র বললে, 'ও আপনাকে লিখে দিতে হবে না স্যার। স্বর-সাধনার অনেক বই আমার আছে।'

—ব'লে ছু'তিনখানা নাম-করা সঙ্গীত-শিক্ষার বইএর নাম উল্লেখ করলো। তারপর এদিনেও সেই আবদার। সে আবার ধ'রে বসলো

আমার এদিনের গাওয়া গানগুলি শিখিয়ে দিতে। আমি চারটি গান গেয়েছিলাম, সবগুলিই তাকে এই মুহূর্তে শিখিয়ে দিতে হবে! দারুণ পীড়াপীড়ি আরম্ভ করলো। রাজি না হ'য়ে আর উপায় কি? আমি একে একে গানগুলি গাইলাম আর সে অর্গ্যানে তুলে নিলে। এইভাবে দিনের পর দিন আমার সঙ্গীত-শিক্ষাদান চলেছে,—প্রত্যহ তিন-চারটি ক'রে গান শেখানো। আমি হতাশ হ'য়ে ছাত্রের কণ্ঠ থেকে গান শোনা একরূপ ছেড়েই দিয়েছি। নিজে থেকে যদি গায়, সে স্বতন্ত্র কথা। মাস ছয়েকের মধ্যে সে প্রায় একশোটি গানে তার ভাণ্ডার ভর্তি করলো। তবু আশা মেটে না। এদিকে অস্বস্তিতে আমার মন ভ'রে থাকে। ছ' মাস ধ'রে গান শেখাচ্ছি, শতখানেক গান শিখলো অথচ একটিও গাইতে পারে না! এর জন্যে তার কিন্তু কোনও অনুতাপ বা অনুশোচনা নেই। বরং দিন দিন উৎসাহ বেড়েই চলেছে!

একদিন ঘটনাচক্রে ঐ অঞ্চলেই আমার একটি প্রাক্তন ছাত্রীর সঙ্গে দেখা। তার পিত্রালয় ঐ পাড়াতেই। বিবাহের পর সে গান-শেখা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। কথায় কথায় সে আমাকে বললে, 'আপনি অমলাকে গান শেখাচ্ছেন?'

আসল নামটি গোপন রেখে এই নকল নাম 'অমলা' আমিই দিলাম।

প্রাক্তন ছাত্রীটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'অমলা? অমলা কে?'

ছাত্রী বললে, 'অমলা আমার বন্ধু। কাল তার বাড়ী গিয়েছিলাম। সে অনেকগুলো গান শোনালে। বললে আপনার কাছ থেকে শিখেছে। দেখলামও, আপনারই হাতের লেখা গানে তার খাতা ভর্তি।'

ছাত্রীটি আমাকে অবাক ক'রে দিলে। তবু বললাম, 'না বাপু,

অমলা ব'লে কাউকে আমি গান শেখাইনে। তার আর কোনো নাম আছে নাকি? কোথায় থাকে?'

ছাত্রীটি মৃদু হেসে বললো, 'না, অন্য কোনো নাম নেই তার। এই পাড়াতেই বাড়ী। বড়লোকের ঘরের বৌ সে। অমুকের স্ত্রী।' —ব'লে ছাত্রীটি আমার সেই জমিদার ছাত্রটির নাম করলো। আমি বললাম, 'হ্যাঁ, সে শেখে বটে, তার স্ত্রী নয়।'

সস্মিত বদনে ছাত্রীটি বললে, 'অমলাই শেখে, তাব স্বামী নয়। তারা বড় পর্দানশীন। আপনি যখন তার স্বামীকে অর্গ্যানে গান তুলে দেন, তখন সে পাশের ঘরটিতে পর্দার আড়ালে চুপ ক'রে ব'সে শোনে আর গুণ-গুণ ক'রে গান গায়।'

'বলো কি!'

ছাত্রী ব'লে চললো, 'তার স্বামী খুব ভালো অর্গ্যান বাজাতে পারেন। তাঁর কাছ থেকে অমলা পরে বাজনা দেখে নেয়। ভারি মিষ্টি গলা অমলার। আপনার শেখানো সব গানই সে সুন্দর গায়।'

'তোমার বন্ধুকে বোলো, এ খবরটি পেয়ে খুবই খুশী হলাম।'

ছাত্রী বললে, 'সে আজ তার বাপের বাড়ী চ'লে গেছে। এখন কিছুকাল সেখানেই থাকবে।'

ছাত্রীটি ঠিকই বলেছিল। এবারে সে-বাড়ীতে গান শেখাতে গিয়ে সেটা মর্মে মর্মে অনুভব করলাম। অন্তঃপুর অন্তর্হিত হ'লো ব'লে, দেখলাম, বহির্বাটি আমার প্রবেশ-পথ বন্ধ ক'রে দিলে।

একটি পর্দানশীন ছাত্রীর কথা বলেছি। তাই ব'লে সে-কালের মহিলারা যে সকলেই পর্দানশীন ছিলেন, তা নয়। তবে এখনকার

একশ্রেণীর অত্যাধুনিকার মতো ভদ্রমহিলা তখনকার দিনে খুব কমই ছিল। সে-সময়ে কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়ীতে সঙ্গীতাদির কোনো অধিবেশন হ'লে কতকগুলি বিষয়ে সভ্যতার রীতি মেনে আমাদের চলতে হ'তো। মেয়েরা উপস্থিত থাকলে বাকসংযম অবশ্য-পালনীয় ছিল, ধূমপান করা তো চলতোই না। তখনকার সভ্য মেয়েরা সিগার বা সিগারেটের উৎকট গন্ধ বরদাস্ত করতে পারতেন না।

একদিন আমাদের সরোজিনী-দিদি (বারীন্দ্রকুমার ঘোষের অগ্রজা) আমাকে বললেন, একটি মহিলাকে গান শোনাতে হবে। তিনি থাকেন 'সমবায় ম্যানসনে'। দিদির অনুরোধ ঠেলবার উপায় নেই, তার ওপর মহিলাটিও ভারত-বিখ্যাত একটি পরিবারের মেয়ে। তাঁকে গান শোনানোতে একটা আত্মতৃপ্তিও আছে।

একটি নির্দিষ্ট দিনে বিকেলবেলায় দিদি আমাকে নিয়ে গেলেন সমবায় ম্যানসনে। ছোট্ট ফ্ল্যাটটি, বেশ সুরুচিসম্পন্ন সাজ-সরঞ্জামে সাজানো। সেই মহিলাটি আর তাঁর স্বামী বাস করেন সেখানে। আমরা যখন গেলাম, সে-সময়ে মহিলাটি একাই আছেন, তাঁর স্বামী কর্মক্ষেত্র থেকে তখনও ফেরেন নি। মহিলাটি মধ্যবয়সী। তাঁর কথাবার্তা, চালচলন, আদবকায়দা দেখে বুঝতে পারলাম, এখানে হিসেব ক'রে চলতে হবে,—হিসেব ক'রে কথা কইতে হবে, কায়দা-দুরস্ত হ'য়ে উঠতে-বসতে হবে, যা আমার স্বভাবে নেই। ভিতরে ভিতরে বড় অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। মহিলাটির সৌজন্যের দিক থেকে কোনো ত্রুটি নেই। অভ্যর্থনা, আদর, আপ্যায়ন প্রভৃতি নিখুঁত। গান গাইলাম প্রায় দেড়ঘণ্টা। যে-ক'টি গান গেয়েছিলাম, সেগুলির মধ্যে একটি গান বোধ হয় মহিলাটির খুবই পছন্দ হয়েছিল। গানটি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের 'এস এস ফিরে এস, বঁধু হে ফিরে এস।' মহিলাটি

আমাকে অনুরোধ করলেন, গানটি তাঁকে শিখিয়ে দিতে হবে। একেবারে কাগজ পেন্সিল এনে আমার সামনে ধ'রে দিলেন তিনি। গানটি আমি লিখতে উদ্যত হয়েছি, এমন সময় তিনি আমাকে বললেন, 'কাইণ্ডলি গানটি ইংরেজী অক্ষরে লিখবেন, বাংলা আমি পড়তে পারিনে।'

কথা শুনে আমি চমকে গেলাম। বাঙালী বামুনের মেয়ে, বাংলা কথা বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে অথচ বাংলার অক্ষর-পরিচয় নেই! মন তো আমার ঘুলিয়েই ছিল,—সেই ঘোলাটে মনে এখন একটা আবর্ত জাগলো। কী আর করি, রোমান হরফে গানটি লিখে দিলাম। তারপর তিনি গানটি শিখতে বসলেন। গানটি শেখা শক্ত নয়,—সাদামাঠা কীর্তনের সুর। দু' একটি কলি শিখলেই পুরো গানটির সুর আয়ত্ত হয়ে যায়। কিছুক্ষণ এইভাবে গান শেখানো চলেছে, এমন সময় তাঁর স্বামী এলেন বাড়ীতে। স্বামীর সঙ্গে তিনি আমার পরিচয় ক'রে দিলেন ইংরেজী ভাষায় কথা ব'লে। পতি-দেবতাটির পোশাক শ্বেতাঙ্গের কিন্তু তিনি কৃষ্ণাঙ্গ। মনে হ'লো অ-বাঙালী। স্বামীর অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সঙ্গীত-পর্ব শেষ হ'য়ে গেল। মহিলাটি কর্মক্লান্ত পতি-দেবতার পরিচর্যায় মনোনিবেশ করলেন। আমরাও স্বল্পক্ষণ পরেই তাঁদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করলাম। সেখান থেকে বেরিয়ে আমি যেন জেলখানা থেকে মুক্তিলাভ করলাম। বিশেষ ক'রে পুরো দু'ঘণ্টা কাল ধূমপান করতে না পেয়ে কী অস্বস্তিতেই না কাটিয়েছি।

প্রায় এক সপ্তাহ পরে সরোজিনী-দিদি আবার আমাকে বললেন, আর একদিন যেতে হবে সমবায় ম্যানসনে। মহিলাটি সে-দিনের-শেখা গানটির সুর নাকি স্থানে স্থানে ভুলেছেন, তাই আর একবার না গেলে

চলবে না। আমি এবার স্পষ্টই বললাম, 'দিদি, সেদিনে বড় কষ্ট পেয়েছিলাম, বিশেষ ক'রে সিগারেট খেতে পারিনি ব'লে।'

দিদি বললেন, 'তা তুমি সিগারেট খেলেই পারতে। এবারে তুমি খেয়ো। কবে যাবে বলো; আমি তাকে খবর পাঠাবো।'

ঠিক হ'লো তিন-চারদিন পরে আবার যাবো। গেলামও। যাওয়ামাত্র মহিলাটি সে-দিনের মতোই সাদর সম্ভাষণ ও অভ্যর্থনা

ক'রে তাঁর বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাকে বললেন, 'নলিনীবাবু, আপনি স্মোক করেন, আমি তো জানতাম না। দিদিও আমাকে

আগে কিছু বলেননি। তাঁর চিঠিতে কাল জানতে পারলাম। সে-দিন আপনার বড় কষ্ট হয়েছে।'

—ব'লে মহিলাটি পাশের টিপয়ের ওপর হাত বাড়ালেন। সেখানে এক টিন সিগারেট ও একটি দেশলাই রাখা ছিল। তারপর সেই সিগারেটের টিনটির ঢাকনা খুলে আমার সামনে ধরলেন। আমি সেই খোলা টিন থেকে একটি সিগারেট বা'র ক'রে নিলাম। মহিলাটি স্বহস্তে দেশলাই জ্বালছেন দেখে সিগারেটটি আমাকে মুখে তুলতে হ'লো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমার অধরোষ্ঠ-ধৃত সিগারেটটির অপর প্রান্তে অগ্নি-সংযোগ ক'রে দিলেন।

কেবল তাই নয়, টিন থেকে সিগারেট বার ক'রে তিনি নিজেও ধরালেন একটি!

ত্রিশ বত্রিশ বৎসর আগের কথা। মনীষী সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্তের (বর্তমানে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সেক্রেটারী) ভ্রাতার বিবাহে বরযাত্রী হ'য়ে গেলাম বহরমপুরে। সেখান থেকে বর-বৌ নিয়ে ফিরে এলাম নলিনী-দা'র বাড়ী—রংপুর জেলার নীলফামারিতে। নলিনী-দা'র পিতা রজনীবাবু ছিলেন নীলফামারির একজন নাম-করা উকিল। নলিনী-দা তাঁর পিতার সঙ্গে সাবধানে কথা কইতে আমাকে ব'লে দিলেন। রজনীবাবু গম্ভীরপ্রকৃতির রাশভারী লোক,—তাঁর পরিবারস্থ ব্যক্তিরাও তাঁর কাছে বেহিসেবী চালে চলেন না। এই সাবধান-বাণী শুনে আমি যথাসাধ্য তাঁকে এড়িয়ে চলতে লাগলাম।

বাড়ীর মহিলাদের বড় ইচ্ছা একদিন আমার হাসির গান

শোনবার। কিন্তু রজনীবাবুর ভয়ে সে-ইচ্ছা তাঁদের পূর্ণ হয় না। শেষ পর্যন্ত স্থির হ'লো, রজনীবাবু যখন কোর্টে থাকবেন সেই সময়ে গানের আসর বসবে। রজনীবাবু 'পসারী' উকিল। মামলাও থাকে অনেক। বাড়ী ফিরতে বিকেল প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। এইরূপে সময়ের একটা হিসেব ক'রে একদিন বিকেল তিনটের সময় বাড়ীর অন্দরমহলে আমার গানের আসর বসলো। সাড়ে চারটা নাগাদ অর্থাৎ রজনীবাবু ফেরার আগেই আমরা গানের আসর ভেঙে দেবো, এটাও ঠিক রইলো। আমি গানের পর গান গেয়ে চলেছি। বেশ জমজমাট আসর। শ্রোতৃবৃন্দের হাসির হর্‌রাও চলেছে। শেষকালে কান্ত-কবির একটি হাসির গান আরম্ভ করলাম,—'আমার বয়েসটা এমন কি বেশী'। গানটির বিষয়-বস্তু হচ্ছে, একজন বিয়ে-পাগলা বুড়ো আর তার চাকরের মধ্যে দ্বিতীয়পক্ষের বিবাহ সম্পর্কে পরামর্শ। বুড়ো ও চাকর—এই দু'জনের দু'রকম কণ্ঠস্বরে আমি গানটি গাইছি। সকলেই গানটি বেশ উপভোগ করছে। গানের মাঝামাঝি একটি জায়গায় হাসবার যথেষ্ট কারণ থাকলেও শ্রোতাদের কাছ থেকে রস-গ্রহণের কোন সায় পেলাম না। আমি আরও রসিয়ে রসিয়ে গাইতে লাগলাম, তাদের মুখে যাতে হাসি ফোটাতে পারি। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। অমন যে শেষের লাইনটা, —'কর্তা, আমি আপনার গলায় দিয়্যা দিমু ফাঁসী'—যেখানে চাপতে গেলেও হাসি ঠোঁটের বাধা ভেদ ক'রে বেরিয়ে আসে, সেখানেও কারো মুখে হাসির রেখাটি পর্যন্ত দেখা গেল না! গানটি শেষ করেছি, এমন সময় একজনের ইঙ্গিতে পেছন দিকে চেয়ে দেখি, কোর্টের পোশাক-পরা অবস্থায় স্বয়ং রজনীবাবু দাঁড়িয়ে! কি জানি কখন এসে তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শুনছিলেন। গান থামতেই তিনি চ'লে গেলেন।

সকলেই সন্ত্রস্ত ;—কার বরাতে কী আছে কে জানে। আমাকে হয়তো সেইদিনই বিদেয় নিতে হবে। যে-গানটি তিনি শুনেছেন, সে-গান আর যেখানেই হোক অন্দরমহলে গাওয়া চলে না। গানটির একটি অন্তরাতে আছে বিয়ে-পাগলা বুড়োর এইরূপ উক্তি ঃ

'আমার চামড়া গেছে ঝুলে,
চোখ গেছে কোটরে,
কোমর গেছে বেঁকে
বেড়াই লাঠি ধ'রে,
তা শৃঙ্গারতিলক কিছু
নেবো তোয়ের ক'রে'…ইত্যাদি।

এই 'শৃঙ্গারতিলক' শুনে রজনীবাবু কী যে মনে করেছেন, তা ভাবতেই আমি শিহরিত হ'য়ে উঠছি। কিন্তু যতটা আতঙ্কিত হ'য়ে উঠলাম, কার্যত তার কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। বুঝলাম, যাই ক'রে থাকি না কেন, হাজার হোক নিমন্ত্রিত অতিথি আমি, অন্তরে বিরূপ হ'লেও আমার প্রতি রূঢ় ব্যবহার করতে পারেন না তিনি। এও মনে হ'লো, অন্তঃপুরে মহিলাদের আসরে এই 'শৃঙ্গারতিলক'-এর গান গাওয়ানোর শাস্তি বোধ হয় নলিনী-দা'কে ভুগতে হবে।

ভাবনায় চিন্তায় সে-দিনটা কেটে গেল। পূর্বনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম অনুসারে পরদিন সন্ধ্যায় আমার গানের ব্যবস্থা করা হয়েছে বহির্বাটীতে। স্থানীয় ভদ্রলোকেরা নিমন্ত্রিত হ'য়ে এসেছেন গান শুনতে। মহিলারা আছেন অন্তরালে। রজনীবাবু কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু নিয়ে বসেছেন একেবারে আমার সম্মুখেই। এদিনে আমি হাসির গান গাইবো না ব'লে মনে মনে সঙ্কল্প করেছি। ভক্তি-রসাত্মক

গান গেয়ে চলেছি একের পর আর। একটি গান শেষ ক'রে আর একটি আরম্ভ করবার উদ্যোগ করছি, এ-হেন সময়ে রজনীবাবু হঠাৎ আমাকে উদ্দেশ ক'রে ব'লে উঠলেন, 'ওহে বাপু, সেই মদনানন্দ মোদকের গানটি একবার গাও তো!—কাল বিকেলে যেটি গেয়েছিলে।'

বুঝলাম, ভদ্রলোক 'শৃঙ্গারতিলক' কথাটা ভুলে গিয়ে সে-জায়গায় মদনানন্দ মোদক বসিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু এ হ'লো কী! এই গানের ফরমায়েস করলেন রজনীবাবু! সকলের মুখেই বিস্ময়ের চিহ্ন!

রস যে ফল্গুধারার মতো কোথায় কিভাবে লুকিয়ে থাকে কে জানে।

কোনো একটি কার্যোপলক্ষে গেছি একবার রামপুরহাটে। সেখানকার স্কুলের ছাত্রেরা ধরলেন গানের জন্যে। একটি হলের মধ্যে গানের আসর বসলো। প্রকাণ্ড হল,—ফরাস-পাতা। কেবল স্কুলের ছেলেরাই নন, অনেকগুলি বয়স্ক ব্যক্তিরও সমাবেশ হয়েছে। এই বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে একজনকে জানতাম খুবই ধর্মপ্রাণ ভক্ত ব'লে। নামই শোনা ছিল, কখনও দেখিনি তাঁকে। এ-রকম শ্রোতা পেয়ে বিশেষ উৎসাহিত হলাম। হারমোনিয়মটি নিয়ে গানের উদ্যোগ করছি, এমন সময় সেই বয়স্ক ব্যক্তি আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কী গান গাইবেন?'

আমি বললাম, 'সাধারণ বাংলা গান।'

তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন, 'কীর্তন জানেন, পদাবলী?'

'জানি দু'চারখানা।'

'রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, নীলকণ্ঠ?'

'কিছু জানি।'

ভদ্রলোকের মনোগত ভাব বুঝতে পারলাম, তিনি ভক্তিমূলক গান শুনতে চান। তাঁকে বললাম, 'রজনী সেনের গান শুনবেন? অনেক গান জানি তাঁর।'

শোনা মাত্র তিনি উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলেন। বললেন, 'আহা, রজনী সেনের গান—সত্যিকার ভক্তের গান। 'কেন বঞ্চিত হব চরণে'—এ-গানের জোড়া আছে?'

—ব'লেই ভদ্রলোক ঘরের ভিতরকার দেওয়ালের দিকে তর্জনী-সঙ্কেত ক'রে বললেন, 'আপনি এঁর গান জানেন না?'

দেওয়ালের ঠিক সেইখানে এক ব্যক্তি বসেছিলেন। আমার মনে হ'লো, ভদ্রলোক বোধ হয় তাঁরই গানের কথা বলছেন। চিন্তিত হ'য়ে পড়লাম,—কে এই কবিটি, যাঁর গান আমার জানা উচিত ছিল? কিছুই ঠাহর করতে না পেরে বললাম, 'আপনি কার কথা বলছেন, ঠিক বুঝতে পারছিনে।'

ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ বললেন, 'বুঝতে পারেননি?—আরে মশায়, আমাদের এই শান্তিনিকেতন।'

কী ক'রে বুঝবো যে, রামপুরহাটের ঘরের ভিতরে ব'সে তিনি দেওয়ালের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে যে-স্থানটি দেখাচ্ছেন, সেটি হচ্ছে—শান্তিনিকেতন। তাঁকে বললাম, 'রবীন্দ্রনাথের গানের কথা বলছেন আপনি? শুনবেন রবীন্দ্র-সঙ্গীত?'

ভদ্রলোক বললেন, 'না মশায়, ও থাক। ওতো গান নয়, ও হচ্ছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। আপনি রজনী সেনের গানই করুন।'

আমার মাথায় দুষ্ট সরস্বতী জাগ্রত হ'লেন। প্রথমেই আরম্ভ

করলাম রবীন্দ্রনাথের 'যদি এ আমার হৃদয়-দুয়ার বন্ধ রহে গো কভু' গানটি। দেখতে পাচ্ছি, চক্ষু দুটি মুদ্রিত ক'রে ভদ্রলোক যেন গানের দেবতাকে ধ্যান করছেন। গানটি গাওয়া শেষ হ'তেই তাঁর ধ্যানভঙ্গ হ'লো। তিনি উচ্ছ্বাসভরে বললেন, 'আহা, রজনী সেন কী জিনিসই দিয়ে গেছেন!'

প্রথম ডোজ ওষুধের সাফল্য দেখে, আর-একটি ডোজ প্রয়োগ করবার ইচ্ছা হ'লো। দ্বিতীয় গান ধরলাম, রবীন্দ্রনাথের 'ওহে জীবন-বল্লভ, ওহে সাধন-দুর্লভ' কীর্তনটি। এবারেও তিনি ধ্যানস্থ হ'য়ে গানটি শুনছেন। গানটির একটি কলি গাইবার সময় দেখি, তাঁর মুদ্রিত দুটি চক্ষুর কোণ থেকে অশ্রুধারা নির্গলিত হচ্ছে। গানের বাণী ভক্তের হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত দিয়ে ভক্তিরসের প্লাবন সৃষ্টি করেছে। গানটি শেষ হ'লে তিনি বললেন, 'আহা, এ গানের কি তুলনা আছে?'

এবারে আমাকে কপটতা পরিহার করতেই হ'লো। তাঁকে বললাম, 'কিন্তু একটু অন্যায় ক'রে ফেলেছি যে!'

ভদ্রলোক বিস্মিত হ'য়ে বললেন, 'অন্যায়?'

আমি সবিনয়ে তাঁকে বললাম, 'পর পর যে গান দুটি গাইলাম, দুটিই রবীন্দ্রনাথের।'

ভদ্রলোক স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন। পরে বললেন, 'বলেন কি, এ-গান রবিবাবুর? রবিবাবুর এ-রকম গান আর জানেন আপনি? গান তো।'

রবীন্দ্রনাথের যে-কয়টি ভক্তিমূলক গান আমার জানা ছিল, একে একে গাইলাম। রবীন্দ্রনাথের গানেই আসর ভাঙলো। বিদায়-কালীন কথাবার্তায় মনে হ'লো, রবীন্দ্রনাথের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধায় তাঁর মন ভ'রে উঠেছে।

কলকাতার বাড়ীতে একদিন রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়ার একজন কর্মচারী এসে আমার এক আসর গানের ব্যবস্থা ক'রে গেলেন। ইতিপূর্বে রাজাবাহাদুর তাঁর বালিগঞ্জের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে একবার আমার হাসির গান শুনেছিলেন। এবারে অন্য ব্যাপার। রথযাত্রার দিনে স্টিমার-পার্টিতে হাসির গানের আসর। কলকাতা থেকে রওনা হয়ে স্টিমার মাহেশ পর্যন্ত যাবে ও আসবে।

ঠিক দিনটিতে হাজির হলাম স্টিমারঘাটে। দেখি, কলকাতার বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্পগুজব করছেন। সকলেই স্টিমার-পার্টির যাত্রী। তাঁদের কাছে শুনলাম, দু'খানি স্টিমার মাহেশ যাচ্ছে। একখানিতে কেবলমাত্র মহিলা-যাত্রী, আর একখানি পুরুষদের। একে একে আমরা পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট স্টিমারে উঠলাম। স্টিমারে দেখতে পেলাম—গানের আসরের জন্য ফরাস পাতা হ'য়েছে। তার ওপর তানপুরা, হারমোনিয়ম, পাখোয়াজ, তব্‌লা-বাঁয়া। যন্ত্রগুলি দেখে মনে হ'লো আরও দু'চারজন গাইয়ে আছেন বোধ হয়। কিন্তু কার্যকালে দেখলাম মাত্র একজন। তাঁকে দেখেই রাজাবাহাদুরের রসিকতা বুঝতে পারলাম। এই স্টিমার-পার্টিতে গানের জন্যে এসেছেন, তখনকার দিনের ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী! আর গোঁসাইজীর গানের আসরে ব্যবস্থা করা হয়েছে আমার গানের! দু'জনে সম্পূর্ণরূপে বিপরীতধর্মী,—এক আকাশে পূর্ণিমা ও অমাবস্যার চাঁদ।

রাজাবাহাদুর আমাকে নিয়ে গিয়ে গোঁসাইজীর সঙ্গে পরিচয় ক'রে দিলেন। পরিচয়-প্রসঙ্গে তিনি গোঁসাইজীকে আমার নামটির উল্লেখ ক'রে বললেন, 'আজ ইনিও গাইবেন।'

আমি যে হাসির গান গাইবো, এ কথাটা আর রাজাবাহাদুর গোঁসাইজীকে বললেন না। আমার সঙ্গে পূর্বে গোঁসাইজীর কোনো পরিচয়ই ছিল না। তিনি হয়তো ঠাওরালেন, তাঁর সঙ্গে যখন এক আসরে গাইবো, তখন আমিও একজন ওস্তাদ-শ্রেণীর গাইয়ে। আমাদের স্টিমার ছাড়লো। পাশাপাশি চলতে লাগলো মেয়েদের স্টিমারখানি। শ্রোতারা এসে গানের আসরে বসলেন। বাদ্যযন্ত্রগুলি সুরে বাঁধা হ'লো। গোঁসাইজী তানপুরাটি বেঁধে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনিই আগে গান।'

আমি গম্ভীর হ'য়ে তাঁকে বললাম, 'তা হয় না, আপনিই গান আগে।'

গোঁসাইজী কিন্তু কিছুতেই ছাড়বেন না, আমাকেই গাওয়াবেন আগে। দেখবেন আমি কত বড় ওস্তাদ। হাসির গান গেয়ে গেয়ে নির্ঘৃণ, নির্লজ্জ ও নির্ভয় হ'য়ে যে আধ্যাত্মিক শক্তি আমি লাভ করেছিলাম তারই বলে গুরুগম্ভীর ভাব দেখিয়ে গোঁসাইজীকে বললাম, 'দেখুন, আমি গান গাইতে আরম্ভ করলে যতক্ষণ আমার আত্মতৃপ্তি না হয়, ততক্ষণ আমি গান ছাড়িনে। এখানে অনেকেই আপনার গান শোনবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছেন,—আগে আপনিই গেয়ে নিন না।'

আমার এই কপট-দম্ভোক্তি শুনে রাজাবাহাদুর ও কয়েকজন ভদ্রলোক ঈষৎ হাস্য করলেন। গোঁসাইজী কিন্তু গম্ভীর। তাঁর মতো গুণী ব্যক্তির সম্মুখে কোনো গায়ক ওরূপ উক্তি করতে পারে, এটা একেবারে অপ্রত্যাশিত। মনে হ'লো, আমার ধৃষ্টতায় তিনি বিরক্তই হয়েছেন।

গোঁসাইজী আর কোনো কথা না ক'য়ে গান আরম্ভ করলেন।

কয়েকটি ধ্রুপদ ও খেয়াল গানে তিনি অপরিসীম আনন্দ দান ক'রে শ্রোতাদের বিশেষ অনুরোধে গাইলেন রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ব্রহ্মসঙ্গীত। আসরে যেন অমৃতধারার বর্ষণ হ'লো। স্টিমার মাহেশে পৌঁছলে গোঁসাইজী থামলেন। এর পর ফেরবার পালা। গোঁসাইজী আমাকে বললেন, 'এবারে আপনি গান।'

হারমোনিয়মটি আমার কাছেই ছিল। সেটিকে কোলের ওপর তুলে নিয়ে আমি মনে মনে ঠিক করলাম—রজনীকান্ত সেনের 'বুয়োর যুদ্ধ' গাইবো। আমার নিজের খুব প্রিয় গান ছিল সেটি। গানটির রাগিণী—ইমনকল্যাণ, তাল—তেওড়া। আমি প্রথমে ওস্তাদী ঢঙে ইমনকল্যাণ রাগিণী আলাপ করতে শুরু করলাম। মিনিটখানেক আলাপ ক'রেই ধ'রে দিলাম—

'বুয়োরে ইংরেজে যুদ্ধ বেধে গেছে
নিত্য আসিতেছে খবর তার—
আজকে এরা ওরে গুঁতুলে বেড়ে ক'রে
কালকে ওরা ধরে জবর মার।'

গোঁসাইজী শোনা মাত্র চমকে উঠলেন। তিনি একেবারেই আশা করেননি যে, অমন ঘটা ক'রে ইমনকল্যাণ আলাপ করতে করতে আমি এই কাণ্ড ক'রবো। সে-গানটি শেষ ক'রে আমি একের পর আর হাসির গানই গাইতে লাগলাম। শ্রোতারা সকলেই অল্পবিস্তর হাসছেন। গোঁসাইজী কিন্তু আগাগোড়া গম্ভীর। স্টিমার যখন কলকাতার প্রায় সন্নিকটে এসেছে ;—গোঁসাইজী আমাকে বললেন, 'কেন এ গান গেয়ে আপনি গলাখানি নষ্ট করছেন? ভালো গান কিছু জানেন তো গান না? ধ্রুপদ, খেয়াল বা ভালো বাংলা গান?'

আমি সবিনয়ে তাঁকে বললাম, 'জানি দু'চারখানা। কিন্তু সে-গান

আপনার সঙ্গে কি এক আসরে আমি গাইতে পারি? ভালো ক'রে গান শেখবার সুযোগই হয়নি।'

গোঁসাইজী আগ্রহভরে বললেন, 'গান শিখবেন আপনি? আমি শেখাবো। আপনার কণ্ঠে ধ্রুপদ খুব ভালো হবে। কিন্তু একটি শর্ত —ঐ সঙের গান গাওয়া ছেড়ে দিতে হবে।'

অমন ওস্তাদ পেয়েও আমার ধ্রুপদ শেখা হ'লো না। ঐ সঙের গানই যে আমার খোরাক যোগায়, তাকে ছাড়ি কি ক'রে!

গান গেয়ে একবার কি রকম খাতির পেয়েছিলাম, সেই কথাটি বলি।

একবার একজন বন্ধুর সঙ্গে নবদ্বীপ গেলাম। নবদ্বীপে তাঁর মাতুলালয়। মাতুলটি বড় ভালো লোক;—সহজ, সরল, অকপট ব্যক্তি। তা ছাড়া বড় স্নেহপ্রবণ। আমাকে তাঁর নিজের ভাগিনেয়ের মতোই গ্রহণ করলেন তিনি। সন্ধ্যার সময় তাঁর বাড়ীতে প্রত্যহ কয়েকজন বন্ধুর সমাগম হ'য়ে থাকে। চা, পান, তামাকের সঙ্গে খোস গল্পের বৈঠক। মামা সেই বৈঠকে আমার গানের আয়োজন করলেন। বেশী জনসমাগম নেই,—বাইরের বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গ নিয়ে দশ-বারোজন শ্রোতা। প্রায় ঘণ্টা দুই গান করলাম পাঁচ ফুলে সাজি সাজিয়ে;—ভক্তির গান, প্রেমের গান, স্বদেশী গান, মায় হাসির গান পর্যন্ত। অন্যান্য শ্রোতাদের কেমন লাগলো জানিনে, মামা কিন্তু খুবই মুগ্ধ হলেন।

পরদিন সকালবেলায় মামা আমাকে বললেন, 'দেখ, আজ কী কাণ্ড করি। আজ আসরের মতো আসর করবো। বড় জায়গা নেই

যে, তা নইলে দেখতে বাপু, আসর কা'কে বলে। এ রকম আসর তোমার কলকাতায় মিলবে না। কলকাতায় তো কেবল চ্যাংড়া ছোকরার ভিড়। এখানে দেখবে বড় বড় গুণী, জ্ঞানী, পণ্ডিত আসবেন গান শুনতে। আজ বেশ ভালো ভালো, বাছা বাছা গান গেয়ো বাপু!'

মামা সারাদিন ভারী ব্যস্ত। সকালবেলাতেই বেরুলেন সন্ধ্যার আসরের শ্রোতাদের নিমন্ত্রণ করতে। দুপুরে বাড়ীতে ফিরে দুটি খেয়েই তাঁর বৈঠকখানার সংস্কারকার্যে ব্যাপৃত হলেন। বিকেলবেলায় দেখলাম, মামা তাঁর বৈঠকখানা ঘরের সংলগ্ন একটি 'পার্টিশন' খুলে ফেলে ঘরটিকে প্রকাণ্ড হলে পরিণত করেছেন। চল্লিশ-পঞ্চাশজন লোকের বসবার ব্যবস্থা।

সন্ধ্যায় গানের আসর বসলো। নবদ্বীপের অনেকগুলি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হ'য়ে এসেছেন। এতগুলি পণ্ডিত ব্যক্তির সমাবেশ আমার কোনো গানের আসরে ঘটবে, এটা আমি আশা করতে পারিনি। আমি আসর বুঝেই গান গাইতে আরম্ভ করলাম। যতগুলি গান গাইলাম, তার অধিকাংশই প্রাচীনকালের গান এবং সমস্ত গানই ধর্মমূলক। পুরো আড়াই ঘণ্টা গানের পর আমি একটু বিশ্রাম নিচ্ছি, এমন সময় মামা একজন পণ্ডিত ব্যক্তিকে কি-যেন একটা ইঙ্গিত করলেন। তাঁর ইঙ্গিতমাত্র পণ্ডিতমশায় আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কবে ফিরবেন কলকাতায়?'

'কাল বিকেলের গাড়ীতে।'

পণ্ডিতমশায় বললেন, 'বিকেলের গাড়ীতে না গিয়ে শেষ রাত্রির গাড়ীতে গেলে হয় না?'

আমি বললাম, 'কেন বলুন তো?'

পণ্ডিতমশায় বললেন, 'কাল সন্ধ্যায় সভা আহ্বান ক'রে আমরা আপনাকে একটি উপাধি ও মানপত্র দেব, মনে করছি। নবদ্বীপে কোনো গুণী ব্যক্তি এলে তাঁকে আমরা এইভাবে সম্মানিত করি। আপনি কালকের দিনটা থেকে ভোরের ট্রেনেই ফিরুন।'

হঠাৎ মামা আমাদের মধ্যিখানে প'ড়ে পণ্ডিতমশায়কে বললেন, 'হাঁ হাঁ, কাল থাকবে বৈকি। ও-সব আমি ঠিক ক'রে দেবো।'

—ব'লে মামা আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'ছুটি-একটি হাসির গান এঁদের শোনাবে না বাপু?'

হাসির গান গাইবার ইচ্ছা গোড়ায় ছিল না, কিন্তু পরিস্থিতি যেরূপ ঘনিয়ে এলো, তাতে না গেয়ে উপায় কি? তার ওপর মাতুলের অনুরোধ। কালবিলম্ব না ক'রে প্রথমে গাইলাম কবি নজরুলের 'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছ জুয়া।' তারপরে কান্তকবি রজনী সেনের 'আমায় ব্রাহ্মণ ব'লে নোয়ায় না মাথা কে আছে এমন হিন্দু।' ব্যস্, ঐ ছুটি গানের গুঁতোতেই আসর ভেঙে গেল। সমাগত পণ্ডিতমহাশয়েরা একে একে প্রস্থান করলেন। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে মামাও উঠে পড়লেন। অমন জমাট আসর শেষের দিকটায় যেন ছত্রভঙ্গ হ'য়ে গেল।

আমরা ছু'চারজন ব'সে আছি। মামা ফিরে এলেন। ফিরে এসেই আমাকে উদ্দেশ ক'রে বললেন, 'দিলে তো সব ভেস্তে!'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হ'লো মামা?'

'আর কি হ'লো! পণ্ডিতদের চটিয়ে দিলে। তা নইলে কাল দেখতে কী রকম সভা হ'তো, কী রকম সম্মান পেতে। ছি, ছি, সব পণ্ড ক'রে দিলে বাপু!'

আমি বললাম, 'সে কি মামা, সভা হবে না, উপাধি দেবে না?'

'ছাই দেবে তোমাকে। তারা ক্ষেপে আগুন হয়েছে। উপাধির বদলে কী ছ্যায় তাই ছ্যাখো তুমি যত শিগগির পারো, কলকাতা

রওনা হও বাপু। তোমার জন্যে হয়তো আমাকেও বিপন্ন হ'তে হবে। পণ্ডিতেরা স্পষ্টই বললেন, বাড়ীতে নেমন্তন্ন ক'রে এনে তোমাকে দিয়ে আমি তাঁদের অপমান করিয়েছি। যাক্, আমার যা হয় হবে, তুমি আর এখানে থেকো না, আজই ভোরের গাড়ীতে কলকাতা চ'লে যাও।'

তাই হ'লো। রজনীর চতুর্থ প্রহরে ধড়ের প্রাণ ধড়ে নিয়ে আমরা কলকাতার ট্রেন ধরলাম। তারপর থেকে আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর অতীত হ'তে চললো, নবদ্বীপ যাইনি।

কলকাতায় একজন বন্ধু প্রায়ই বলেন, তাঁদের ক্লাবে গাইবার

জন্যে ; আমার আর যাওয়া হ'য়ে ওঠে না। একদিন সন্ধ্যায় হেদোয় বেড়াচ্ছি, এমন সময় বন্ধুবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ। তিনি একেবারে ধ'রে বসলেন—আজ যেতেই হবে, কিছুতেই ছাড়বেন না তিনি। হেদোর খুব কাছেই ক্লাবটি। মাত্র দু'এক মিনিটের পথ।

বন্ধুর সঙ্গে গেলাম একটি বাড়ীতে। সেই বাড়ীর বৈঠকখানা-ঘরে ক্লাব। গৃহস্বামী একাই বসে ছিলেন ঘরটিতে। তিনি আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। শুনলাম, তিনি স্বয়ং একজন কুশলী তব্‌লাবাদক। ঘরের মধ্যে দেখলাম, দেয়ালের গায়ে ঝোলানো তানপুরা, সেতার, এসরাজ প্রভৃতি। মেঝের এক-কোণে কয়েকটি তব্‌লা-বাঁয়া।

আমাদের একটু আলাপ-পরিচয়াদি হচ্ছে, এমন সময় আরো চারজন সদস্য এসে প্রবেশ করলেন কক্ষটিতে। গান হবে শুনে তাঁরাও খুব খুশী হলেন। সকলেরই আগ্রহাতিশয্যে আর কালবিলম্ব করা চললো না। গৃহস্বামী তব্‌লা বাঁধতে বসলেন। ঘরের যন্ত্রপাতি দেখে আর ভদ্রলোকদের কথাবার্তা শুনে মনে হ'লো, এখানে নিতান্ত লঘু-সঙ্গীত চলবে না। এই ভেবে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনে আমার যত আনন্দ পেয়েছি দিবস রাত' গানটি গাইতে বসলাম। ব্রহ্ম-সঙ্গীত,—ভাবের গান, ভক্তির গান। চক্ষু-দু'টি মুদ্রিত ক'রে তন্ময় হ'য়ে গাইছি। গানের আস্থায়ীটি শেষ ক'রে সবেমাত্র অন্তরাতে পৌঁছেছি, অকস্মাৎ কর্ণকুহরে প্রবেশ করলো—টু ইন্ ক্লাবস্, টু হার্টস্, টু নোট্রাম্পস্-এর সুমধুর ধ্বনি। চক্ষুরুন্মীলন ক'রে প্রাণ জুড়িয়ে গেল। সবে-ধন পাঁচটি শ্রোতার মধ্যে চারজন তাস নিয়ে ব্রিজে বসেছেন! অন্য কোনোদিকে দৃক্‌পাত নাই,—একাগ্রচিত্ত হ'য়ে তাঁরা তাসে নিমগ্ন। আমি কোনোক্রমে গানটি শেষ করলাম। গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে

আর এক ব্যক্তি হাঁফাতে হাঁফাতে এসে একেবারে আসরের মাঝখানটিতে ব'সে পড়লেন। গৃহস্বামী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি খবর ?'

'দাঁড়াও আগে গান শুনি।'

—ব'লে ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'বাড়ী থেকে আপনার আওয়াজ শুনে ছুটে আসছি মশায়। শোনান তো একটা ঠাকুরের গান। আজ মনটা বড় খারাপ হ'য়ে আছে। যদি একটু শান্তি পাই।'

সম্প্রতি আমারও যে মনটা বড় খারাপ হ'য়ে পড়েছে, আর আমিও শান্তির প্রত্যাশী, সেটা গোপন ক'রে তাঁকে বললাম, 'আমার

শরীরটে আজ ভালো নেই। পথ থেকে বন্ধুটি ধ'রে আনলেন, তাই আসতে হ'লো। আর একদিন এসে শোনাবো।'

'তা হয় না মশায়। অন্ততঃ একটি-ও গান। আচ্ছা, আপনি ওই কীর্তনটি জানেন ?—অশ্বিনী দত্তের 'তুমি মধু, তুমি মধু ?'—বড় ভালো গান।'

আমার আর গাইবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। তাস-খেলোয়াড়েরা অনন্যমনা হ'য়ে পরম উৎসাহভরে ব্রিজের ওপর দিয়ে চলেছেন তখনও। কিন্তু এই ভদ্রলোকটির আকুল আগ্রহ দেখে মনে করলাম তাঁর ফরমায়েসী কীর্তনটি গেয়েই উঠে পড়বো। অতঃপর আমি গানটি গাইবার উদ্যোগ করছি, গৃহস্বামী তবলার ওপর কিঞ্চিৎ

করস্পর্শ করেছেন, এমন সময় অকস্মাৎ সেই ভদ্রলোকটি আমাকে বললেন, 'অনুগ্রহ ক'রে একটু অপেক্ষা করুন, এক মিনিট।'

—ব'লে, তিনি আমার দিকে পিছন ক'রে গৃহস্বামীর দিকে ফিরে বসলেন। গৃহস্বামী ডান-হাতখানি তব্‌লার ওপর রেখে বেশ বাগিয়ে বসেছেন সঙ্গত করবার জন্যে। ভদ্রলোকটি তাঁর সেই হাতখানি ধ'রে কাঁদো-কাঁদো সুরে বলতে লাগলেন, 'সব মাটি ক'রে দিলে ভাই, উকিলটা সব মাটি ক'রে দিলে! সাক্ষীগুলোকে ভালো ক'রে জেরা-ই করলে না। সকালবেলায় তার বাড়ী গিয়ে অতো ক'রে শিখিয়ে-পড়িয়ে এলাম, তার একটি কথাও বললে না। নির্ঘাৎ হেরে যাবো ভাই; তুমি তো সবই জানো,—এ মামলা কি হারবার?'

তাঁর একটি মামলায় সেদিন কোন্ সাক্ষীকে কিভাবে জেরা করতে হবে, এ সম্পর্কে উকিলকে যা-যা শিখিয়েছিলেন, তার একটা ফিরিস্তি দিতে আরম্ভ করলেন। অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের দুঃখে তাঁর মন কিরূপ তোলপাড় করছে, সঙ্গে সঙ্গে তারও বর্ণনা চলতে লাগলো। প্রায় পনেরো মিনিটকাল এই শ্রুতিমধুর বিবরণ শোনবার পর আমি আস্তে আস্তে উঠে বাইরে চ'লে এলাম। আমার বহির্গমনের উদ্দেশ্য তাঁরা কি ভাবলেন জানিনে, আমি সটান কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে এসে ট্রামে উঠে পড়লাম। তখনো হয়তো তাঁদের মামলার কথা পুরোদমেই চলেছে!

মনে পড়লে হাসি পায়, সঙ্গীতকে যখন পেশারূপে গ্রহণ করি তখন কোনো লোকের কাছে টাকার কথা পাড়তে কী সঙ্কোচই না হ'তো—লজ্জায় যেন মাথা কাটা যেত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে-সঙ্কোচ এমনই কেটে গেল যে, পুরো দোকানদার হ'য়ে পড়লাম—ফ্যালো কড়ি মাখো তেল!

কোনো একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রতি-অনুষ্ঠানে আমার ডাক পড়তো। এটি আমার বাঁধা-ঘর হ'য়ে পড়েছিল। কনসেসন ফী স্বরূপ তাঁরা মাত্র দশটি টাকা আমাকে দিতেন। প্রতি বৎসরে তাঁদের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল—প্রাক্তন ছাত্র-সম্মেলন। এই উৎসবটিতে তাঁরা প্রচুর অর্থব্যয় করতেন। কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা নিমন্ত্রিত হতেন এই অনুষ্ঠানে ; এ ছাড়া প্রাক্তন ছাত্রের সংখ্যাও বড় কম হ'তো না। জলযোগের ব্যবস্থাও থাকতো প্রচুর। নোস্তা ও মিষ্টান্নে এক-একটি মৃৎথালিকা পরিপূর্ণ। সমারোহ ব্যাপার। সমাগত সকলেই ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত হতেন। এই প্রতিষ্ঠানের একটি ছাত্র একদিন আমার কাছে এসে হাজির। আবার প্রাক্তন ছাত্র-সম্মেলনের দিনটি এসেছে। আমাকে যেতেই হবে। ছাত্রটিকে বললাম, 'তোমাদের কাছে তো দরদস্তুর করতে হবে না, ভাই ; কবে, কখন যেতে হবে বলো।'

ছেলেটি দিনক্ষণ সব জানিয়ে দিয়ে বললে, 'এবারে কিন্তু আমাদের টাকা বেশী ওঠেনি। এবারটি কিছু দিতে পারবো না স্যার!'

আমি বললাম, 'টাকার কথা বলছো?'

'হাঁ।'

'তার জন্যে কি হ'লো,—খাওয়াবে তো?'

ছেলেটি লজ্জিত হ'য়ে পড়লো। বললো, 'ও কী কথা বলছেন, খাওয়াবো বৈকি।'

'ঠিক আগের বার যেমন খাইয়েছিলে—নিম্‌কি, সিঙাড়া, কচুরী, আলুর-দম, সন্দেশ, রাজভোগ—'

ছেলেটি হেসে ফেলে বললে, 'এবারেও সবই আছে, কিছু বাদ যাবে না।'

আমিও হেসেই তাকে বললাম, 'আমার একটি পরামর্শ শুনবে?'

'কি বলুন?'

'সিঙাড়াটা এবারে বাদ দিয়ো।'

ছেলেটি বললে, 'কেন স্যার, গেল বারে সিঙাড়া কি ভালো হয়নি?'

সহাস্যবদনে আমি বললাম, 'চমৎকার হয়েছিলো। কিন্তু আমার প্রাপ্য দশটি টাকা দিয়ে সিঙাড়া কিনে তোমরা কলকাতার বড়-লোকদের এবারে খাওয়াবে, সেটা কি ভালো দেখায়? সিঙাড়া বাদ দিয়ে আমার টাকা দশটি আমাকে দিয়ো।'

ছেলেটি অপ্রতিভ হ'য়ে বললে, 'আচ্ছা তাই হবে। আপনি কিন্তু যাবেন।'

তাঁদের অনুষ্ঠানে গেলাম, গাইলাম, খেলাম এবং টাকা দশটি নিয়ে এলাম। বলা আবশ্যক—সিঙাড়াও বাদ যায়নি।

একটি মেয়েদের গানের ইস্কুলে শিক্ষকতা করেছিলাম। এখন তো কলকাতা শহরের অলিগলিতে সঙ্গীত-বিদ্যালয়। আমাদের সেকালে মেয়েদের গান শেখার স্কুল অতি অল্পসংখ্যক ছিল। আমি যে-স্কুলে গান শেখাতে গেলাম, সেখানে সপ্তাহে তিন দিন গান শেখানোর ব্যবস্থা ছিল। স্কুলের পরিচালকের সঙ্গে অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর মাইনে ঠিক হ'লো মাসে ত্রিশ টাকা। প্রতি মাসে বারো দিন হাজিরা, একটি দিন কামাই করলে আড়াই টাকা কাটা যাবে! প্রত্যহ দু'ঘণ্টা ডিউটি।

প্রথম মাসটি হেসে-খেলে কেটে গেল। এ মাসের পুরো মাইনেটা

পেয়ে গেলাম দ্বিতীয় মাসের গোড়াতেই। মনটা খুশিতে ভ'রে উঠলো। কিন্তু যার বরাত মন্দ, তার সুখ সইবে কেন ? গোল বাধলো দ্বিতীয় মাসের মাইনে পেতে। ছাত্রীরা নাকি তাদের দেয় বেতন যথাসময়ে দিতে পারেনি। তাই পরিচালক মহাশয় আমার বেতনও যথাসময়ে দিতে পারলেন না। যুক্তি অকাট্য। সর্ষে জোগান না দিলে বলদে ঘানি থেকে তেল বের করে কি ক'রে ? কিন্তু যুক্তিতে তো পেট ভরে না, পোড়া পেটের জন্যে খোরাক যে চাই-ই চাই। পরিচালক মহাশয়কে মাইনের জন্যে নিয়মিত তাগিদ দিতে লাগলাম। আর তিনি আমার অযৌক্তিক তাগিদে বিরক্ত হ'য়ে নিতান্ত অনিচ্ছায় পকেট ঝেড়ে কোনো দিন দেড় টাকা, কোনো দিন দু'টাকা, কোনো দিন তিন টাকা —কিস্তির পর কিস্তি চালাতে লাগলেন। এই এক মাস বেতনের কিস্তির পুষ্পমালিকাটি পূর্ণাঙ্গ ক'রে যখন তিনি প্রেমভরে আমার কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন, তখন আমার প্রতি অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করতে করতে চতুর্থ মাসও বিগতপ্রায়। ভাবলাম, এ কাজ ছেড়ে দিই। কিন্তু তাই বা কি ক'রে হয় ?—মাইনে পাওনা রয়েছে যে ? আছি ব'লে তবু কিছু পাচ্ছি, ছাড়লে কি আর মিলবে ? কিন্তু বোকার মতো তখনও ভাবিনি যে, যত-বেশী দিন যাবে, পাওনাটাও বেড়ে যাবে তত বেশী। শেষে যেদিন কাজটা ছাড়লাম, সেই দিন এই আক্কেলটি হ'লো ! ছ'মাস কাজ করলাম,—দু'মাসের মাইনে অতল জলধি-জলে নিমজ্জিত হ'য়ে রইলো।

অতঃপর যখনই ও-পথ দিয়ে যাই, তখনই একটিবার তাগিদ দিয়ে পাওনা আদায়ের চেষ্টা করি। আমার অজ্ঞাতসারে স্কুলের স্থান পরিবর্তন হয়েছে, আমি একান্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে সে-স্থান আবিষ্কার করেছি। কবি বলেছেন, 'নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন, হবেই

হবে।'—এই ঋষিবাক্য শিরোধার্য ক'রে চেষ্টার পর চেষ্টা করেছি; হয়েছেও কিছু কিছু এবং ভবিষ্যতে হবেই হবে মনে ক'রে মনে-প্রাণে ভরসা রেখেই চলেছি।

এইভাবে চার-পাঁচ বৎসর কেটে গেছে। একদিন আমি আর বন্ধুবর বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র রেডিয়ো-অফিস-ফের্তা দু'জনে বিকেলবেলায় ট্রামে ক'রে শ্যামবাজার অভিমুখে চলেছি। হঠাৎ বৌবাজারের মোড়ে স্কুল-পরিচালককে দেখতে পেলাম; আমরা যে-ট্রামে চলেছি তারই সেকেণ্ড ক্লাসে তিনি উঠলেন। বীরেনবাবুকে বললাম, 'একজনের কাছে কিছু পাওনা আছে, দেখলাম লোকটি সেকেণ্ড ক্লাসে উঠলো। দেখি, যদি পাওনাটা আদায় করতে পারি।'

—ব'লে, মেডিকেল কলেজের সামনে ফার্স্ট ক্লাস থেকে নেমে

সেকেণ্ড ক্লাসে উঠে পড়লাম। উঠেই ভদ্রলোকের সঙ্গে চারি চক্ষুর মিলন হ'লো। মিলনান্তে আমার প্রাপ্যের কথাটা পাড়লাম। অনেক

খোশামোদ, অনেক অনুনয়-অনুরোধের ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর যখন আমার কণ্ঠস্বরে কিঞ্চিৎ উষ্ণতা প্রকাশ পেল—তখন তিনি পকেট থেকে কিছু বের ক'রে আমায় দিলেন। আমিও খুশী হ'য়ে তৎক্ষণাৎ গ্রে স্ট্রীটের মোড়ে সেকেণ্ড ক্লাস থেকে নেমে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের সঙ্গে পুনর্মিলিত হলাম। বীরেনবাবু বললেন, 'পাওনা আদায় হ'লো ?'

'হাঁ, কিছু হ'লো বৈকি।'

'কত ?'

'তিন টাকা পাওনা ছিল, দিলে চার আনা।'

বীরেনবাবু হাঁ ক'রে চেয়ে বললেন, 'চার আনা আপনি নিলেন ?'

আমি বললাম, 'এমনি ক'রে আজ পর্যন্ত সাতান্ন টাকা চার আনা আদায় হ'লো। বাকি রইলো দু'টাকা বারো আনা।'

বীরেনবাবু কিছুক্ষণ হাঁ ক'রে আমার দিকে চেয়ে থেকে, পরে বললেন, 'যেমন দেনদার, তেমনি পাওনাদার !'

নিজের পাওনাগণ্ডা বুঝে নিতে কেউ কসুর করে না। যারা টাকার ফুরন ক'রে গাইয়েকে নিয়ে যায়, তারা তার শেষবিন্দুটি পর্যন্ত দুয়ে নিয়ে তারপর টাকা বের করে। এখনকার কালে উৎসবাদিতে যেমন অ্যাম্প্লিফায়ার সহযোগে গ্রামোফোনের রেকর্ড অবিশ্রান্তভাবে বাজানো হয়, তখনকার দিনে আমাকেই গাইতে হয়েছে ঐ গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো নির্বিকারচিত্তে অবিরাম উচ্চকণ্ঠে।

উত্তর কলকাতার কোনো একটি ধনীসন্তানের গৃহে বিবাহ উপলক্ষে আমার বায়না হ'লো। অর্থের ব্যবস্থা বেশ ভালো। উৎসব-দিবসে বিবাহ-বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। একজন ভদ্রলোক আমাকে

সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দ্বিতলের একটি সুপ্রশস্ত কক্ষে স্থাপন করলেন। ঘরটির এক প্রান্তে একটি হারমোনিয়ম। বুঝলাম গানের আসর বসবে এইখানেই। ঘরের ভিতর আমি একা। ঘরটির বারান্দার দিকে ছুটোছুটি করছে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা। প্রায় আধ ঘণ্টাকাল জড়যন্ত্রের মতো একটি কোণে বিরাজ করছি ;—ক্রমে ক্রমে দু'চারজন নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক সঙ্গে স্বয়ং গৃহস্বামী মহাশয় সেই কক্ষে প্রবেশ ক'রে একজনের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে উচ্চ চিৎকার ক'রে বললেন, 'ইনি গাইবেন, গান শুনুন।'

—ব'লেই, গৃহস্বামী মহাশয় ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। শ্রোতাটি বোধহয় বধির। আমি হারমোনিয়মটি টেনে নিয়ে একটু বাজিয়ে দেখছি, কেমন যন্ত্রটি। ঐ একটু সুর শুনেই পঙ্গপালের মতো শ্রোতার দল যেন উড়ে এসে ঘর জুড়ে বসলো। শতকরা নব্বুইটি শ্রোতার বয়স পাঁচ থেকে দশের মধ্যে। ঘরের ভিতর আর তিল ধারণের স্থান নেই। যে কয়টি বয়স্ক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, 'এইবারে গান আরম্ভ হোক।'

আমি ভেবেছিলাম, আরও দু'চারজন গাইয়ে আসবে। কিন্তু বুঝলাম, আমার একারই আসর। যাক্, হুকুম যখন হয়েছে, তখন হারমোনিয়মটি কোলের ওপর তুলে নিয়ে ঐ বাল-বিদগ্ধ-সভায় গান আরম্ভ করতেই হ'লো। শ্রোতারা স্থানে-অস্থানে হেসে উঠছে, পরস্পরের গায়ে লুটিয়ে পড়ছে, এ ওর গায়ে ধাক্কা দিচ্ছে ; একটি সর্বকনিষ্ঠ শ্রোতা আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠে দাঁড়িয়ে নাচতে লাগলো। অদ্ভুত পরিবেশ। আমার গান যখন অর্ধপথে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে, এমন সময় একজন ভদ্রলোক দরজার কাছে এসে বললেন, 'পাতা হয়েছে।'

ব্যস্‌, পড়ি-কি-মরি হ'য়ে আমার শ্রোতার দল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল! নিমেষে কক্ষটি জনশূন্য। নিঃঝুম ঘরে একা ব'সে আছি, এমন সময় গৃহস্বামী ঘরে ঢুকে দণ্ডায়মান অবস্থাতেই আমাকে বললেন, 'কই, আপনি গাইবেন না?'

আমি সবিনয়ে বললাম, 'গাইছিলাম তো। সকলেই খেতে চ'লে গেল। আসুক দু'চারজন। এখন শুনবে কে?'

গৃহস্বামী বললেন, 'তা হ'লেই হয়েছে মশায়। আজ নেমন্তন্ন বাড়ী, আজ কি লোকে গান শুনতে আসছে যে আপনি তাদের আশায় ব'সে আছেন? তারা তাদের কাজে আসছে, আপনি আপনার কাজে এসেছেন। আপনি গেয়ে যান। নিমন্ত্রিত লোকেরা এসে কেউ-বা একটু শুনলো বা না-শুনলো—খেয়ে চ'লে গেল। একদল যাবে, আর-একদল আসবে। এই তো হবে আজ। আজ কি লোকে গান শুনবে মশায়? আপনি গেয়ে যান।'

পরিস্থিতিটা বোধগম্য করিয়ে দিয়ে গৃহস্বামী চ'লে গেলেন। চিন্তায় পড়লাম। ক্ষোভ ক'রে আর লাভ কি? নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের জন্যে দই-সন্দেশ-ছ্যাঁচড়া-চাটনির মতো আমিও আজ একটা উপভোগের উপকরণ! পাতে পরিবেশন নিয়ে কথা। ইচ্ছে হয় খাবে, নয় ফেলে রেখে চ'লে যাবে। বোম-পট্‌কা, ছুঁচোবাজি, আতসবাজির খেলা যেমন সকলকে দেখানো হচ্ছে, তেমনি আমাকেও দেখানোর জন্যে আনা হয়েছে। যে জন্যে পয়সা খরচ ক'রে বাজি পোড়াচ্ছে, সেই একই হেতুতে আমাকেও জ্বালাবার অধিকার নিশ্চয়ই তাদের আছে।

এবার আমার অভিনয়ের কথাও একটু বলি। আমি যে কতো

বড় অভিনেতা এ মূল্যবান সংবাদটি দুর্ভাগা দেশের অতি অল্পসংখ্যক ভাগ্যবানই জানে। বিশ্বাস না হয়, জিজ্ঞাসা করুন স্বনামধন্য অভিনেতা ও নাট্যশালার যুগপ্রবর্তক শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়কে। একমাত্র তিনিই পেয়েছিলেন আমার এই অসাধারণ প্রতিভার পরিচয়।

এও ত্রিশ বত্রিশ বৎসর আগেকার কথা। তখনকার কালের সুবিখ্যাত ওল্ড ক্লাবের প্রধান পাণ্ডাদের একজন ছিলেন শিশিরকুমার। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট ও এই ওল্ড ক্লাবের নাট্যাভিনয় দেখে কলকাতার শিক্ষিত বিদগ্ধ সমাজ শিশিরকুমারের অসাধারণ অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় পান। আর এই ওল্ড ক্লাবেই শিশিরকুমার অভিনেতৃরূপে আমাকে আবিষ্কার করেন। ওল্ড ক্লাবে আমার নিয়মিত যাতায়াত ছিল। সেখানেই তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা জন্মে। সে-সময় শিশিরকুমার ও তাঁর কয়েকজন বন্ধু প্রায় প্রত্যহ ওল্ড ক্লাবে রাত্রিযাপন করতেন। কোনো কোনো দিন রাত্রিটা আমিও তাঁদের সঙ্গে ওল্ড ক্লাবেই অতিবাহিত করতাম।

শিশিরকুমার তখন সবে ম্যাডান থিয়েটারে ঢুকেছেন। কয়েকখানি নাটক অভিনয়ের পরে তিনি 'রঘুবীর' অভিনয় করবার উদ্যোগ করছেন। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে তখন রঘুবীরই তাঁর একমাত্র চিন্তা। একদিন রাত্রে বাড়ী ফিরিনি, ওল্ড ক্লাবেই শুয়ে আছি। রাত্রি দুটো-তিনটের সময় আচমকা একটি ধাক্কায় ঘুম ভেঙে গেল। চক্ষুরুন্মীলন ক'রে দেখি স্বয়ং শিশিরকুমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে। বললেন, 'একবার উঠুন তো—'

কোনো আকস্মিক বিপদ হয়েছে ভেবে ধড়মড়িয়ে উঠে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি হয়েছে ?'

শিশিরবাবু বললেন, 'কিছু হয়নি। জাফর হ'য়ে একটু দাঁড়ান দিকি ঐখানে—রঘুবীরের একটা প্যাঁচ মাথায় এসেছে। আপনি স্রেফ দাঁড়িয়ে থাকুন।'

দাঁড়ালাম। আর শিশিরকুমার আমার দিকে চোখ পাকিয়ে আরম্ভ করলেন ঃ

'চিনিতে কি পারো জাঁহাপনা? আরে আরে! তুমি কোথা যাও? এ কি পাপস্পর্শে শূন্যদেহ এত কম্পমান! নাও ব'সো।'···

ভাব-ব্যঞ্জনার সঙ্গে কণ্ঠস্বরে বিবিধ বৈচিত্র্য এনে, নানারূপ অঙ্গভঙ্গী ও পাদচারণায় সে-ভাবকে রূপায়িত ক'রে রিহার্সাল চললো প্রায় এক ঘণ্টা। আমি তন্দ্রালস-নেত্রে ঘরের একটি কোণে স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে আছি জাফর হ'য়ে। কিন্তু কি আশ্চর্য, সেই স্থাণুর ভিতরেই তিনি অফুরন্ত অভিনয়-রসের সন্ধান পেলেন। আর, আমার অন্তর্নিহিত এই রসের মহাপ্রকাশ হ'লো কিছুকাল পরে।

১৯২৪ সালের ১৮ই মার্চ দোলযাত্রার দিন শিশিরকুমার তাঁর

'নাট্যমন্দির' প্রতিষ্ঠিত করেন আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে। এই প্রতিষ্ঠা-দিবসে 'বসন্তলীলা' অভিনয় করার জন্যে শিশিরকুমার তোড়জোড় করছেন—এহেন কালে একদিন সকাল বেলায় তিনি আমার গৃহে সহসা আবির্ভূত হলেন; বললেন, 'বসন্তলীলায় কৃষ্ণের ভূমিকায় নামতে হবে আপনাকে। যাকে পার্টটি দিয়েছিলাম, তার সঙ্গে একটু গোল বেধেছে। আর বেশী দেরী নাই, মাত্র চার-পাঁচদিন বাকি।'

চিন্তিত হ'য়ে পড়লাম বৈকি। একটু আপত্তিও করলাম। কিন্তু শিশিরকুমার দৃঢ়কণ্ঠে কতকগুলি উৎসাহব্যঞ্জক কথা ব'লে অতি সহজেই আমাকে সম্মত করালেন। থিয়েটারে অভিনয় করতে আমার অনিচ্ছার মূল কারণ ছিল লোকনিন্দার ভয়। তা নৈলে সঙ্কোচের কোনো কারণই ছিল না। সহস্রবার সহস্র আসরে সহস্র সহস্র শ্রোতার সম্মুখে হাসির গান গেয়ে স্টেজ-ফ্রি তো হ'য়েই আছি। হাসির গান গাইতে হ'লেও খানিকটা অভিনয় করতে হয়। কাজে-কাজেই থিয়েটারে অভিনয় করতে নেমে, সে-কার্য যে আমি অসঙ্কোচে ও অনাড়ষ্টভাবে সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করতে পারবো, এ আত্মবিশ্বাসও মনের মধ্যে জাগ্রত হ'লো।

আমাকে রাজী করিয়ে শিশিরবাবু চ'লে গেলেন। তাঁর নির্দেশ মতো বিকেলবেলায় গেলাম আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে। শিশিরকুমার আমাকে নিয়ে গিয়ে সমর্পণ করলেন সঙ্গীতশিক্ষক কৃষ্ণচন্দ্র দে মহাশয়ের হস্তে। কৃষ্ণের ভূমিকার গানগুলি আমাকে শিখিয়ে দেবার জন্যে তিনি কৃষ্ণবাবুকে ব'লে দিলেন। কৃষ্ণবাবু সর্বপ্রথমে আমাকে শেখাতে আরম্ভ করলেন রবীন্দ্রনাথের 'সখি জাগো, মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখি।' কৃষ্ণবাবুকে বললাম, 'ও গান আমি জানি।'

'জানেন? গান তো?'

কৃষ্ণবাবুকে শোনালাম গানটি। তিনি একটি গান শেখানোর খাটুনি থেকে রেহাই পেলেন ব'লে খুশীই হলেন। অতঃপর বসন্তলীলার যে-দৃশ্যে এই গানটি ছিল, সেই দৃশ্যের রিহার্স্যালের জন্যে শিশিরবাবু আমাকে নিয়ে গেলেন স্টেজের ওপর। অনেকগুলি অভিনেত্রী ও অভিনেতা এবং শিশিরকুমারের কয়েকজন বন্ধুবান্ধবও উপস্থিত রয়েছেন সেখানে। স্টেজের মধ্যিখানে একটি লম্বা কৌচ। সেই কৌচের একটি প্রান্তে শিশিরকুমার আমাকে বসিয়ে দিলেন। সমবেত সকলেরই সমুৎসুক দৃষ্টি আমার দিকে নিবদ্ধ। তাঁরা আমাকে শিশিরবাবুর বন্ধু এবং একজন সাধারণ গাইয়ে ব'লেই জানতেন। আমি যে একজন অভিনয়-কুশলী ব্যক্তি, এ সংবাদ তাঁদের সম্পূর্ণ অগোচর ছিল।

শিশিরকুমারের নির্দেশ মতো কৌচের প্রান্তে আমি বেশ কায়দা ক'রে ব'সে রইলাম। তারপর তিনি রাধার ভূমিকা অভিনয়ের জন্য মালিনী নাম্নী একজন অভিনেত্রীকে সেই কৌচের অবশিষ্ট অংশে শুইয়ে দিলেন। মালিনীর মাথাটি রইলো আমার উরুর ওপর। অতঃপর তিনি আমার বাম হস্তটি মালিনীর মস্তকের একপার্শ্বে স্থাপন ক'রে, দক্ষিণ হস্তটি তার চিবুকে স্পর্শ করিয়ে দিলেন। এবার নিদ্রাতুরা রাধাকে 'সখি জাগো' ব'লে শ্রীকৃষ্ণের জাগাবার পালা। কৃষ্ণবাবু হারমোনিয়মে গানটি বাজাতে আরম্ভ করলেন। আমি নির্বাক্! কিন্তু নিস্পন্দ নই—বুকের ভেতরটা ঢিবঢিব ক'রে ঘন ঘন স্পন্দিত হ'য়ে চলেছে। হারমোনিয়মে দু'তিনবার গানের প্রথম লাইনটি বাজানো হ'য়ে গেল। তবু আমার কণ্ঠে গান নেই; শিশিরবাবু বললেন, 'গান ধরুন।'

আর, গান ধরুন! আমার কণ্ঠ ও রসনা—উভয়ই তখন বিশুষ্ক,

অসাড়। তবু আত্মসম্মান বজায় রাখবার জন্যে আমি ভিতরের সমস্ত দুর্বলতা জোর ক'রে চেপে কম্পিত-কণ্ঠে গাইতে আরম্ভ করলাম, 'সখি জাগো জাগো, মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখি।' পাখির আত্মারাম

তখন প্রায় খাঁচাছাড়া। না মেলে হারমোনিয়মের সঙ্গে কণ্ঠের সুর, না হয় ভাবের সঙ্গে স্বরের সঙ্গতি। সমবেত অভিনেত্রী ও অভিনেতারা করপুটে অধরোষ্ঠ আবৃত ক'রে প্রকাশোদ্যত হাসি কায়ক্লেশে অবরুদ্ধ ক'রে রেখেছেন। অনন্যোপায় হ'য়ে শিশিরবাবু বললেন, 'নলিনীবাবু, আপনি একটু বিশ্রাম করুন। বুঝতে পারছি, আপনার অসুবিধে হচ্ছে।'

স্বেদসিক্ত ললাট রুমালে প্রোঞ্ছিত ক'রে আমি কৌচ থেকে উঠে সলজ্জ পদসঞ্চারে অন্যত্র গিয়ে উপবেশন করলাম।

শিশিরকুমারের চিত্তে আবার কৃষ্ণচিন্তার উদয় হ'লো।

আশ্চর্য! তবু শিশিরবাবু হাল ছাড়লেন না। আমাকে তিনি তাঁর রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ করাবেনই, এ যেন তাঁর সঙ্কল্প হ'য়ে দাঁড়ালো। তাঁর সে-বাসনা পূর্ণ হ'লো স্টার রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' অভিনয়ে। একদিন রাত্রিকালে বাড়ী ফিরে শুনলাম, শিশিরবাবু স্মরণ করেছেন। পরদিন প্রাতঃকালে স্টার থিয়েটারে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। সেইদিনই সন্ধ্যায় 'যোগাযোগ' অভিনয়। এই নাটকাভিনয়ে আমাকে দু'টি দৃশ্যে পথিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়ে রবীন্দ্রনাথের দুইটি গান গাইবার জন্যে তিনি সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন। যিনি এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন, তিনি হঠাৎ কলকাতার বাইরে চ'লে গেছেন,—সুতরাং আমাকে নামতেই হবে। সমস্ত শুনে আমিও বিপন্ন হ'য়ে পড়লাম। কারণ, সে-সময় আমি সর্দি-কাসিতে ভুগছি। গলা দিয়ে ভালো ক'রে স্বরই বেরুচ্ছে না, গান গাওয়া তো দূরের কথা। আমার কথার স্বর শুনে শিশিরবাবু অভয় দিয়ে বললেন, 'ও কিছু নয়, এক্ষুনি সারিয়ে দিচ্ছি। চলুন আমার সঙ্গে।'

শিশিরকুমার তাঁর গাড়ী ক'রে আমাকে নিয়ে গিয়ে তুললেন ডাক্তার অমরেশ ভট্টাচার্যের চেম্বারে। ডাক্তারবাবু রোগের পরীক্ষার পর আমাকে চেয়ারে বসিয়ে গলদেশে একটি লম্বা-চওড়া ফেটি জড়িয়ে তার অপর প্রান্ত ইলেক্‌ট্রিক প্লাগ পয়েন্টে জুড়ে দিলেন। প্রায় আধ ঘণ্টাকাল এই বৈদ্যুতিক চিকিৎসা ক'রে তিনি আমায় নিষ্কৃতি দিয়ে কতকগুলি বড়ি চুষে খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। সেই বড়ি চুষতে চুষতে শিশিরবাবুর সঙ্গে ফিরে এলাম স্টার রঙ্গমঞ্চে। সেখানে এসে

তাঁকে শোনালাম রবীন্দ্রনাথের 'ওহে জীবনবল্লভ' গানটি। দেখলাম, আমার ভাঙা গলা জোড়া লেগেছে। সম্পূর্ণ না সারলেও বৈদ্যুতিক প্রবাহে বারো আনা ফল ফলেছে। শিশিরবাবু ও আমি দু'জনেই ভরসা পেলাম। মধ্যাহ্নে বাড়ী ফিরে, স্নানাহার সেরে কিছুক্ষণ নিদ্রাবস্থায় অতিবাহিত ক'রে বিকেল তিনটেয় শয্যাত্যাগের পর দেখি, কণ্ঠস্বর যথা পূর্বং। চোষবার বড়ি তখনও দু'চারটি ছিল। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। আবার ছুটলাম শিশিরকুমারের কাছে। তিনি বললেন, 'না না, ও ঠিকই আছে। · আপনি নেমে পড়ুন তো।'

ঐ অবস্থাতেই নামবার জন্যে প্রস্তুত হ'তে হ'লো। যথাকালে ঢুকলাম সাজঘরে। একটি গেরুয়া রঙের আলখাল্লায় আপাদগ্রীবা আবৃত করলাম। মুখমণ্ডলের অধিকাংশ আবৃত করলাম আবক্ষলম্বিত শ্মশ্রু ও কৃত্রিম গুম্ফ দিয়ে। মস্তকে গৈরিক উষ্ণীষ। আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে নিজেই নিজেকে চিনতে পারি নে। এই অদ্ভুত গাত্রাবরণে সম্পূর্ণ আত্মগোপন ক'রে যথাসময়ে এসে দাঁড়ালাম উইংস-এর পাশে। অর্গান-বাদকের বাজনার সঙ্গে ভগ্নকণ্ঠে 'ও-হে জীবনবল্লভ' গানটি গাইতে গাইতে প্রবেশ করলাম স্টেজে। পাদপ্রদীপের সম্মুখে দাঁড়িয়েই দেখি সম্মুখের দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে বন্ধুবর সজনীকান্ত দাস। তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে যে-দিকে চাই, সেই দিকেই কোন-না-কোন সাহিত্যিক বন্ধু। মনে করলাম, উঁচুদিকে চেয়ে স্নায়বিক দুর্বলতা পরিহার করবো। দেখি, উপরের বক্সে ব'সে আছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এ যেন 'যেদিকে অঙ্গদ চায়, সেদিকে রাবণ।' সকলেরই কাছে যে আমার সত্যকার স্বরূপ ধরা পড়েছে, তাঁদের ভাবের অভিব্যক্তিতেই তা বেশ বুঝতে পারছি। পুরো গানটি আর গাওয়া হ'লো না ;—গাইতে গাইতে অপর পার্শ্বের উইংস দিয়ে প্রস্থান করলাম। প্রেক্ষাগৃহ থেকে

সজনীকান্ত বারংবার 'এন্‌কোর, এন্‌কোর' ধ্বনি উচ্চারণ করতে লাগলেন কিন্তু আমি আর ফিরলাম না। এ যে সজনীকান্তের 'এন্‌কোর'!

প্রকাশ থাকে যে, পরের আর একটি দৃশ্যে আমাকে আর অবতীর্ণ হ'তে হয়নি।

দৈব অনেক সময় মানুষের অনুকূল হয়, আর তাকে সার্থক ক'রে তুলতে হয় পুরুষকারের ভিতর দিয়ে। দৈব একবার আমারও অনুকূল

হ'য়েছিল অর্থাৎ জীবনের আর্থিক উন্নতির জন্যে একবার একটি চান্স পেয়েছিলাম। পুরুষকারেরও অভাব ছিল না, বরং কয়েকজন কৃতী পুরুষের আনুকূল্যও লাভ করেছিলাম। তবু যেন সব ভেস্তে গেল।

ফিল্ম-এর কথা বলছি। বেশী দিনের কথা নয়,—উত্তর কলিকাতার অনেকেরই মনে আছে হয়তো। সোনোরে পিক্চার্স নামে একটি সবাক চিত্রগ্রহণ প্রতিষ্ঠানের একজন স্বত্বাধিকারী আমাকে বললেন যে, তাঁরা অমৃতলাল বসুর 'খাসদখল' নাটকখানি সবাক-চিত্রে রূপায়িত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। ঐ চিত্রনাট্যে রাজর্ষি মনোমোহন মাইতির ভূমিকায় তাঁরা নির্বাচিত করেছেন আমাকে। আর, তাঁরা আমার 'নারী-প্রগতি' গানটিরও চিত্ররূপ দেবেন, এইরূপ ইচ্ছা করেছেন। 'নারী-প্রগতি' সম্বন্ধে কথা হ'লো—আমি পর্দার আড়ালে থেকে গানটি গাইবো আর পর্দার ওপরে চানী দত্ত আর উষাবতী যথাক্রমে দাদামশায় ও দিদিমার মূক অভিনয় করবেন। 'খাসদখল' চিত্র দেখানোর পূর্বে দেখানো হবে আমার 'নারী-প্রগতি'। আমি অবিলম্বে রাজী হ'য়ে গেলাম। তাঁরা আমাকে যেতে বললেন, তাঁদের স্টুডিয়োতে। স্টুডিয়োও বেশী দূরে নয়,—আপার সার্কুলার রোড আর গ্রে স্ট্রীটের মোড়ে, যেখানে এককালে মায়াপুরী সিনেমা ছিল। সিনেমা বন্ধ হওয়ায় সেখানে এই সোনোরে পিকচার্স-এর স্টুডিয়ো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

'খাসদখল'এর রিহার্সাল আরম্ভ হ'লো। মাইতির ভূমিকা আমি গ্রহণ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে 'নারী-প্রগতি'ও চললো। 'খাসদখল'এর পরিচালক হলেন চানী দত্ত। এরূপ পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা বোধ হয় সিনেমা-জগতে কোথাও কখনো হয়নি। যাঁরা অর্থব্যয় করছেন, তাঁদের কখনও এ-বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। চানী দত্তেরও পরিচালনা কার্যে এই বার সবে হাতেখড়ি,—ইতঃপূর্বে তিনি কোনো সবাক চিত্র

পরিচালনা করেননি। আবার, যে যন্ত্রটিতে চিত্রগ্রহণ কার্য সম্পন্ন হচ্ছে সেটিও পরীক্ষামূলক। এ ছাড়া গ্রে স্ট্রীট ও সার্কুলার রোডের সংযোগ-স্থলে, কোলাহলপূর্ণ স্থানে, এইজাতীয় প্রতিষ্ঠানও পরীক্ষা-মূলক। আমিও পরীক্ষামূলক ভাগ্য নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেছি। দেখি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারি কি না।

অতিরিক্ত শক্তিসম্পন্ন বৈদ্যুতিক আলোকে আমাদের মাথার চুল ও কোম্পানীর স্বত্বাধিকারীদের কপাল পুড়িয়ে চিত্রগ্রহণ কার্য কয়েক মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হ'য়ে গেল। সম্পূর্ণ হ'য়ে যাবার পর সংবাদপত্রে এবং শহরের প্রাচীর-গাত্রে বিজ্ঞাপিত হ'লো মুক্তি-দিবসের শুভ সংবাদ। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে গেলাম নিজের অভিনয় দেখতে এবং সকলকে দেখাতে।

উত্তর কলিকাতারই একটি সিনেমা-গৃহে ছবির প্রদর্শনী। জাঁকিয়ে বসলাম সকলে। যবনিকা অপসারণের পর আমাদের চক্ষুর সম্মুখে রূপালী পর্দায় ফুটে উঠলো 'নারী-প্রগতি'। আমি নিজে পর্দার আড়ালে থেকে গাইছিলাম ব'লে তেমন উৎসাহ পেলাম না ছবিটিতে। পরে 'খাসদখল' আরম্ভ হ'লো। এই পরীক্ষামূলক ছবি গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শকদের ধৈর্যেরও পরীক্ষামূলক হ'য়ে পড়লো। পরিচালনা, অভিনয় বা চিত্রনাট্যরূপ—এ সবের কোনো ত্রুটি ধরবার কিছুমাত্র উপায় নাই। কারণ, একটি দৃশ্যও সুস্পষ্টরূপে দেখা গেল না বা একটি শব্দও সুস্পষ্টভাবে শোনা গেল না। মাইতির ভূমিকায় আমি গেয়েছিলাম, 'কর কর আরোহণ প্রেমের স্যন্দনে' গানটি। সবই আমার মাঠে মারা গেল। নিজের অভিনয় দেখলাম—কুয়াসার ভিতর দিয়ে ভূতের মতন যেন চলেছি। এই চলার সঙ্গে-সঙ্গেই সবাক-চিত্র-পথে আমার চলবার আশাও পঞ্চভূতে মিলিয়ে গেল!

একবার একটি গানের ইস্কুলে গান শিখতে গিয়েছিলাম। সেই ইস্কুলের একজন ওস্তাদের কাছে ধ্রুপদ-খেয়াল শিখবো এইরূপ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মনের আশা মুকুলেই ঝ'রে গেল। ওস্তাদজীর প্রিয় ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও আমারই বুদ্ধির দোষে সে-ইস্কুলে গান-শেখা আর হ'লো না আমার।

ব্যাপারটা গোড়া থেকেই বলি। ঐ ইস্কুলেরই পরিচালক মহাশয় একদিন আমাকে বললেন, 'আপনি আমাদের ইস্কুলে ওস্তাদজীর কাছে গান শিখুন,—মাইনে দিতে হবে না।'

পয়সা দিতে না হ'লে আমরা বিষ পর্যন্ত খেতে পারি, গান তো আমার প্রিয় জিনিস। একদা একদিন বৈকালে—জানিনে সেটা বিষ্যুৎবারের বারবেলা ছিল কি না—ওস্তাদজীর কাছে নিয়ে গিয়ে পরিচালক মহাশয় আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে সেখান থেকে চ'লে গেলেন। ওস্তাদজী আমাকে বললেন, 'আপনি ধ্রুপদ-খেয়াল কিছু জানেন?'

'দু'একটি জানি বটে, কিন্তু না-পড়ে পণ্ডিত হওয়া গোছের। কোনো ওস্তাদের কাছে পদ্ধতি-মতো গান শিখিনি। একবার সুযোগ হ'য়েছিল রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয়ের কাছে গান শেখবার। তিনি নিজে থেকেই শেখাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু একটি দিনও যেতে পারিনি তাঁর কাছে।'

ওস্তাদজী বিজ্ঞের মতো বললেন, 'বেশ করেছেন। ও কি গাইতে পারে? ওর তো গলাই নাই—শুধু নাক।'

গোঁসাইজীর প্রতি এই অশোভন উক্তি শুনে আমি মনে মনে

ওস্তাদজীর ওপর চ'টে গেলাম, কিন্তু মনের অবস্থাটা তাঁকে আর জানতে দিলাম না।

ওস্তাদজী ইস্কুলের উচ্চশ্রেণীতে আমাকে ভর্তি ক'রে নিলেন। দু'একটি গানও শিখলাম ওস্তাদজীর কাছে। ওস্তাদজী যত্ন ক'রে শেখাচ্ছেন আর আমিও মন দিয়ে শিখছি। উচ্চশ্রেণীর ছাত্র হ'লেও আমি মাঝে মাঝে নিম্নশ্রেণীতে গিয়েও ব'সে থাকতাম ;—বিশেষ ক'রে সে-শ্রেণীতে যখন রবীন্দ্র-সঙ্গীত শেখানো হ'তো। আমি চুপটি ক'রে সেই শ্রেণীতে ব'সে দু'একটি রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিখে নিতাম।

একদিন ঐ নিম্নশ্রেণীতে ব'সে আছি। রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিখিয়ে মাস্টারমশায় চ'লে গেলেন আর সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভূত হলেন আমার সেই ওস্তাদজী। শুনলাম, তিনি একটি চতুরঙ্গ শেখাবেন। আমি ব'সেই রইলাম। ওস্তাদজী তাঁর আসনটিতে ব'সে একটি ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার হাতে ওটা কি বই হে ?'

'আজ্ঞে, স্বরলিপির বই।'

'কার গানের স্বরলিপি ?'

'রবীন্দ্রনাথের।'

ওস্তাদজী আপন মনেই বলতে লাগলেন, 'হুঁঃ, মনে করেছিলাম, লোকটার মৃত্যুর পর এ জিনিসটা দেশ থেকে উঠে যাবে—তার আবার স্বরলিপি ক'রে, বই ক'রে ছাপিয়ে রাখছে !'

ওস্তাদজীর কথা শুনে আমার পিত্তি জ্বলে গেল। আমরা তখন গোঁড়া রবীন্দ্রভক্ত। আমি আর চুপ ক'রে থাকতে পারলাম না। ওস্তাদজীকে বললাম, 'রবীন্দ্রনাথের গানের ওপর আপনি এত চটা কেন ?'

ওস্তাদজী বললেন, 'ও কি গান ? ওতো বাউল।'

আমি বললাম, 'গান কি না, সে তো তর্কের কথা। কিন্তু যদি শুধু বাউলই হয়, তবে বাউল কি গান নয়?'

ওস্তাদজী ব্যঙ্গভরে যেন জনান্তিকে বললেন, 'বাউলই যদি গাইবি, তবে আলখাল্লা প'রে একতারা হাতে নিয়ে, নূপুর পায়ে দিয়ে নেচে নেচে গা। হারমোনিয়ম নিয়ে ও ঢঙ করা কেন?'

আমি তখন সসম্ভ্রমে এবং সবিনয়ে ওস্তাদজীকে বললাম, 'আপনারা যখন ঠুংরী-দাদরা গান তখন কি ঘাগরা প'রে, কাঁচুলি এঁটে, চোখ দুটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গান?'

ওস্তাদজী এবারে দপ ক'রে জ্বলে উঠলেন। বললেন, 'আপনি আমাকে তো অপমান করছেনই, আমার ধ্রুপদ-খেয়াল, টপ্পা-ঠুংরীকেও অপমান করছেন।'

আমি আবার বিনয়ের সঙ্গেই বললাম, 'আপনাকে কি আমি অপমান করতে পারি? আপনি যে আমার গুরু। আর ধ্রুপদ-খেয়াল, টপ্পা-ঠুংরী আমি শিখতে এসেছি, ও-গানকে কি আমি অপমান করতে পারি?'

ওস্তাদজী রুক্ষস্বরে বললেন, 'গানের আপনি কি বোঝেন? রবি ঠাকুরের গানে কি আছে?'

আমি বললাম, 'আজ্ঞে, তাল-মান রাগ-রাগিণী সবই আছে; এ-ছাড়া আর একটি বস্তু আছে যা আপনাদের গানে নাই,—সে হচ্ছে কথা।'

ওস্তাদজী একেবারে ক্ষেপে গেলেন। বললেন, 'আমাদের গানে কথা নাই,—এত বড় কথা? আপনি হিন্দী জানেন?'

আমি ব'লে বসলাম, 'আপনি জানেন?'

'নিশ্চয়ই জানি।'

আমি ধীর শান্তভাবে ওস্তাদজীকে বললাম, 'তা হ'লে আমি একটা হিন্দী গান করি, আপনি তার মানে ব'লে দিন।'

ওস্তাদজী গর্বভরে বললেন, 'গান আপনি।'

আমি একখানি ধ্রুপদ গাইতে আরম্ভ করলাম, একেবারে দারুণ বিলম্বিত লয়ে। গানের আস্থায়ীর প্রথম শব্দটি তিনটি অক্ষরের। সেই তিনটি অক্ষরের প্রত্যেকটির ব্যবধান এতই বিলম্বিত করলাম যে, দ্বিতীয় অক্ষরটি শোনবার সময় প্রথম অক্ষরটির কথা আর শ্রোতাদের স্মরণে থাকে না। এইরূপে শম্বুকাতিশম্বুক গতিতে আস্থায়ীর প্রথম লাইনটি গেয়ে ওস্তাদজীকে বললাম, 'বলুন তো এর মানে কি ?'

ওস্তাদজী বললেন, 'আপনি যদি পাগলের মতো যা তা আবোল-তাবোল বকেন…'

আমি বললাম, 'আবোল-তাবোল বকিনি। যে-লাইনটি গাইলাম, তার মানে আপনি তো জানেনই, এই ক্লাসের প্রত্যেকটি ছাত্রও জানে। কেবল আপনাদের স্টাইলে গাইলাম ব'লে গানের একটি বর্ণও বোঝা গেল না।'

ওস্তাদজী বললেন, 'কি গাইলেন আপনি ?'

আমি আসলে গান গাইনি। আমি গেয়েছিলাম নিতান্ত গদ্যময় একটি লাইন, লাইনটি হচ্চে গ্রাম্য ভাষায় ইতরশ্রেণীর লোকেদের বিশেষ একটি গালাগালি। এ গালাগালির সঙ্গে বাঙালীমাত্রেরই পরিচয় আছে। সেই গালাগালিটি আমি গেয়েছি রাগিণী ইমনকল্যাণ, তাল চৌতালের বিলম্বিত লয়ে। ওস্তাদজীকে যখন সেই লাইনটি আবৃত্তি ক'রে শোনালাম, তখন তিনি উত্তেজিত হ'য়ে আমাকে বললেন, 'আমাকে গালাগালি দিচ্ছেন আপনি ?'

কৃতাঞ্জলিপুটে আমি নিবেদন করলাম, 'আপনাকে আমি

গালাগালি দিতে পারি? আপনি যে গুরু। আমি কেবল বলতে চাই যে, আপনারা যে ঢঙে গান করেন তাতে কথার কোনোই মূল্য নেই; দেবতাদের স্তবস্তুতি বা ইতরজনের গালাগালি, দু'য়েরই তুল্য মূল্য।'

ওস্তাদজী ততোধিক উত্তেজিত হ'য়ে বললেন, 'আপনি বেরিয়ে যান ক্লাস থেকে, আপনাকে আমি আর গান শেখাবো না।'

যে লাইনটি ধ্রুপদে রূপায়িত হ'য়ে উঠেছিল, তার কথাগুলি এই—'শালার বেটা শালা, তুই আমার কি করতে পারিস?'

আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, সুকণ্ঠ গায়ক উমাপদ ভট্টাচার্য একদিন আমাকে বললেন, 'একটি কলিয়ারীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী কলকাতায় এসেছেন। তাঁদের কলিয়ারীতে একটি উৎসব উপলক্ষে গানের আসর করতে চান। ভদ্রলোকটি আমার পরিচিত। আমার ওপরেই তিনি গায়ক-নির্বাচনের ভার দিয়েছেন। তুমি যাবে?'

আমি তখন রেডিয়ো অফিসে চাকরি করি। সরকারী চাকরি। অফিস পালিয়ে সহসা কলকাতার বাইরে যাওয়া সম্ভবপর হয় না। আবার আর একটি বিপদ আছে: সরকারী চাকরি করতে করতে অন্য কোথাও থেকে অর্থোপার্জন করা চলে না। আমি খুব সাবধান হ'য়ে এই বে-আইনী কার্যটি ক'রে থাকি। অত্যন্ত সঙ্গোপনে এ কাজ করতে হয়। সাহেবের কাছে রিপোর্ট হ'লে আর রক্ষা থাকবে না। উমাপদকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেমন লোক তাঁরা?'

'ভালো লোক। আমার বিশেষ পরিচিত। এই ব্যাপারে গাইয়েদের জন্যে তাঁরা দু'শো টাকা বরাদ্দ করেছেন। আমি মনে

করেছি—তুমি, আমি আর নজরুল তিনজনে এখান থেকে যাবো। নজরুল তো টাকা নেবেই না। সুতরাং ঐ দু'শো টাকা আমরা দু'জনে সমান ভাগে ভাগ ক'রে নেবো।'

প্রস্তাবটি এতক্ষণে বেশ শ্রুতিসুখকর হ'লো। এখনকার কালে এক আসর গান গেয়ে একশো টাকা উপার্জন করা একজন গাইয়ের পক্ষে এমন-কিছু বিস্ময়জনক নয়, কিন্তু আমাদের সেকালে আমাদের পক্ষে এটা একরূপ অভাবনীয় ছিল। পরম উৎসাহভরে উমাপদকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আসরটি কবে হে?'

'সামনের রবিবার।'

দিনটিও খাসা। শনিবারে অফিস ক'রে স্বচ্ছন্দে সেখানে যাওয়া যায় এবং গান-বাজনা সেরে ভোর রাত্রির গাড়ীতে রওনা হ'লে অফিসও করা যায় সোমবারে। সুতরাং ছুটি চাওয়ার বালাই নেই। অতএব অতি সহজেই সম্মত হ'য়ে গেলাম। একশো টাকা!—চারটিখানি কথা?—সহজে ছাড়া যায়?

বিকেলবেলায় বন্ধুবর নজরুল এলেন আমার বাড়ীতে। কী উৎসাহ তাঁর। তাঁর প্ররোচনার ঠ্যালায় আমার প্রাণান্ত হবার দাখিল। আমি যে কলিয়ারীর অনুষ্ঠানে যেতে রাজী হয়েছি, সেটা তিনি শুনেও শুনতে চান না। বারংবার অনুরোধ করতে লাগলেন, 'চলো নলিন্-দা, চলো, তোমাকে কলিয়ারী দেখিয়ে আনি এবার।'

কয়লার খনি এর আগে দেখলেও নজরুলের মতো অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। বর্ধমান-বীরভূম জেলার সীমান্তে চুরুলিয়া গ্রামে তাঁর বাড়ী। সেখান থেকে কয়লার খনি খুব বেশী দূরে নয়। শিয়ারসোল ইস্কুলে তাঁর পাঠ্যজীবন কেটেছে,—সেখান থেকেও কলিয়ারী খুব কাছে। কলিয়ারীর বর্ণনায় নজরুল পঞ্চমুখ হ'য়ে

উঠলেন। আমি যত বলি, 'কলিয়ারী আমি দেখেছি ভাই, তোমাকে আর অত ব্যাখ্যা করতে হবে না', নজরুল তত উত্তেজিত হ'য়ে বলেন, 'দেখেছো তো কয়লার চাঁই, আর কী দেখেছো? এই কয়লার খনিতে মানব-চরিত্রের কত রহস্য লুকিয়ে আছে, তার খবর রাখো?'

—ইত্যাদি ব'লে, তিনি কয়লা-খনির শ্রমিকদের ও মালিকদের সম্বন্ধে অনেক গুহ্য কথা ক'য়ে নিরস্ত হলেন।

শনিবারের সন্ধ্যার ট্রেনে আমরা তিন বন্ধুতে রওনা হলাম। সারাক্ষণ ট্রেনে হৈ হৈ ক'রে কাটিয়ে মধ্য রাত্রিতে পৌঁছলাম সেই কলিয়ারীতে। পরদিন সন্ধ্যায় বসলো গানের আসর। আমরা তিনজনে তিন-চার ঘণ্টা গাইলাম। নজরুল স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি ক'রে, স্বরচিত গান গেয়ে শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তে এক অপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি করলেন, উমাপদ রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও আধুনিক সঙ্গীতে মধু বর্ষণ করলেন,—আমিও কয়েকটি হাসির গান গাইলাম। প্রায় রাত বারোটায় আসর ভাঙলো। পূর্ব-ব্যবস্থা মতো সে-দিনই শেষ-রাত্রির ট্রেনে আমার কলকাতা রওনা হবার কথা। কারণ, আমাকে অফিস করতেই হবে;—ছুটি নিয়ে আসিনি। এদিকে এঁরা ধ'রে বসলেন পরদিন সোমবারে আর এক আসর গানের জন্যে। আমি কিন্তু কিছুতেই থাকতে রাজী হলাম না। অনেকে অনেক অনুরোধ করলেন, এক ব্যক্তি সৎপরামর্শ দিলেন অফিসে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিয়ে ছুটি চাইবার জন্যে। নজরুল তো জিদ ধ'রে বসলেন, একটি দিন থাকতেই হবে। নজরুলকে কাকুতি-মিনতি ক'রে বললাম, 'লক্ষ্মী ভাই, আমাকে ছেড়ে দাও। তোমরা সরকারী চাকরীর আইন-কানুন জানো না,—উপরওয়ালাকে না জানিয়ে আমরা স্থানত্যাগ

পর্যন্ত করতে পারিনে। এই যে ছুটির দিনে এখানে এসেছি, এটাও বে-আইনী। আমাকে ছেড়ে দাও ভাই।'

উমাপদ কাছেই বসে ছিলেন। তিনি আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে চুপি চুপি বললেন, 'এরা কালকের আসরের জন্যে আরও টাকা দেবে, নলিনী-দা।

আমি বিরক্ত হ'য়েই বললাম, 'রেখে দাও তোমার কালকের টাকা। আজকের টাকাটা এখন এনে দাও তো। আমি এখনই রওনা হ'য়ে যাবো।'

উমাপদ গেলেন টাকা আনতে। নজরুল আবার আমাকে নিয়ে পড়লেন আর-এক দিন থাকার প্রসঙ্গ তুলে। কিছুক্ষণ পরে কলিয়ারীর একজন কর্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে উমাপদ ফিরে এলেন। কর্মচারীটি আমাকে বললেন, 'রাত্তিরে আমাদের অফিস বন্ধ থাকে, খাজাঞ্চীমশায়ও শুয়ে পড়েছেন—এখন তো টাকাটা আপনাকে কোনোমতেই দিতে পারলাম না। আপনি এখনই কলকাতা রওনা হ'য়ে যাবেন শুনলাম, তা আপনি যান, কাজীসাহেব ও উমাপদবাবু তো রইলেন, এঁদের হাতে আপনার টাকাটা পাঠিয়ে দেবো।'

এই ব্যবস্থাতেই স্বীকৃত হ'য়ে আমি সেই রাত্রেই সেখান থেকে রওনা হ'য়ে পরদিন কলকাতা পৌঁছলাম। দিন দুই পরে উমাপদ ভট্টাচার্য ফিরলেন। দেখা হওয়া মাত্র অনুনাসিক স্বরে তিনি বললেন, 'ও নলিনী-দা, টাকা তো দিলে না, বললে, নজরুলের হাতে পাঠিয়ে দেবে।'

আমি তো আশ্চর্য হ'য়ে গেলাম। বললাম, 'বলো কি হে, টাকা দিলে না! নজরুল সেখানে রইলো কেন?'

'সেখানকার আবালবৃদ্ধবনিতা সব ছেঁকে ধরলো নজরুলকে, আর

সে দিব্যি রাজী হ'য়ে থেকে গেল। আমাকে বললে, 'তুমি যাও, আমি দু'দিন পরে যাবো।'

নজরুল ফিরলেন দিন পনরো পরে। নজরুল তখন থাকেন এণ্টালী অঞ্চলে পানবাগানে। তাঁর ফেরার খবর পেয়ে আমি ও উমাপদ দু'জনেই গেলাম নজরুলের কাছে। নজরুলকে আমাদের টাকার কথা বললাম। নজরুল বললেন, 'তোমাদের টাকার কথা পর্যন্ত তারা তুললে না। আমাকে শুধু একখানা সেকেণ্ড ক্লাসের টিকেট কিনে দিয়ে ট্রেনে তুলে দিলে।'

আমি বললাম, 'আমাদের টাকাটা তুমি চাইলে না? তুমি তো জানতে আমাদের টাকা তারা ছায়নি।'

নজরুল বললেন, 'চাইবার ফুরসতই পেলাম না যে। আমি আশা করেছিলাম, ট্রেনে ওঠবার সময় হয়তো তোমাদের টাকাটা তারা দেবে। কিন্তু আমি যেই ট্রেনে উঠলাম, সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন ছেড়ে দিল আর তারাও চ'লে গেল! আমার মনে হয়, ভুলে গেছে তারা। তারা অত্যন্ত ভালো লোক। দেখো, তোমাদের টাকা পাঠিয়ে দেবে।'

দেখতে দেখতে চোখের ওপর দিয়ে তিন-চার মাস, ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেখিয়ে, দিবসের পদক্ষেপে কালের গণ্ডী উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল। টাকা আর এলো না! আরও মাস দুই পরে একদিন সকালবেলায় নজরুলের বাড়ী গেছি। দেখি, অনেকগুলি ভক্ত দ্বারা পরিবৃত হ'য়ে নজরুল বিশ্রম্ভালাপে মত্ত হ'য়ে আছেন। সেই ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে নয়ন সার্থক ক'রে দেখতে পেলাম, আমাদের চিরবাঞ্ছিত সেই কলিয়ারীর মালিকটিকে। প্রাণে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হ'লো ভদ্র-লোকটিকে দেখে। হয়তো এতদিন পরে টাকাটা নিয়েই এসেছেন।

নজরুল আড্ডা জাঁকিয়ে তুলেছেন হাসির হুল্লোড়ে, চটকদার

মজলিসী গল্পে। সকলকার দৃষ্টি নজরুলের প্রতিই

সকালকার এই আড্ডা ভাঙলো দুপুরে, বেলা বারোটার পরে। ওঠবার সময় দেখি, কলিয়ারীর মালিকটি কোন্ শুভ মুহূর্তে সেখান থেকে স'রে পড়েছেন।

আর কখনও আমার ভাগ্যাকাশে তাঁর উদয় হয়নি।

গান গাইয়ে টাকা দিলে না বর্ধমান; কিন্তু সেই বর্ধমান গান না-গাইয়েও টাকা দিয়েছে। খাটানোর চুক্তিতে শ্রমিক নিযুক্ত ক'রে না-খাটিয়ে টাকা ছায়, এমন মহৎ উদার ব্যক্তি জগতে ক'জন আছে?

বর্ধমানের একজন জজের বিদায়-অভিনন্দন উপলক্ষে বার এসোসিয়েশনের উকিলেরা আমাকে পঁচিশ টাকা দক্ষিণায় বায়না ক'রে গেলেন। ঠিক দিনটিতে বর্ধমানে হাজির হলাম। যতদূর স্মরণ হয়, আদালত-গৃহের প্রকাণ্ড লম্বা বারান্দায় এই সভার অধিবেশন হয়েছিল। সভাক্ষেত্রে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমাবেশ হয়েছে, তার মধ্যে অধিকাংশই উকিল। জজসাহেবের গুণগান কীর্তন ক'রে বক্তার পর বক্তা ভাষণ দিয়ে চলেছেন। বক্তৃতা শেষ হবার পর আমার ডাক পড়লো, হাসির গান গাইবার জন্যে। সভায় উকিলের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক দেখে, আমি কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের 'উকিল' গানটি দিয়েই আমার গাওয়া আরম্ভ করবো ভেবে উঠলাম। হারমোনিয়মটি নিয়ে ধরলাম—

'আমরা জজের প্লীডার
যত পাব্লিক মুভমেণ্টে লীডার'···ইত্যাদি।

অনেকেই গানের রস গ্রহণ করছেন, এটা বেশ বুঝতে পারলাম।

অকস্মাৎ একজন উকিল দাঁড়িয়ে উঠে আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনাকে আমরা পয়সা খরচ ক'রে নিয়ে এসেছি কি গাল খাবার জন্যে ? আপনি বন্ধ করুন এ গান।'

আমি আস্তে আস্তে মঞ্চ থেকে নেমে পড়লাম এবং সকলের অজ্ঞাতসারে বাইরে এসে একখানি ঘোড়ার গাড়ি ধ'রে সটান স্টেশনে উপস্থিত হলাম। কিছুক্ষণ পরে উঠে পড়লাম একখানি কলকাতাগামী ট্রেনে। ট্রেনের কামরায় ব'সে আছি, এমন সময় একজন ভদ্রলোক হাঁফাতে হাঁফাতে এসে আমাকে আবার সভায় নিয়ে যেতে জিদ করতে লাগলেন। আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'য়ে ব'সে রইলাম কামরার মধ্যে। যখন ট্রেনটি ছেড়ে দিল, তখন ভদ্রলোকটি প্লাটফর্মের ওপর থেকে আমার কোলের ওপর পঁচিশটি টাকা ছুঁড়ে দিলেন। টাকা কুড়িয়ে নেবার পর আর তাঁকে দেখতে পেলাম না!

একটি জামাই-ষষ্ঠীর কথা বলি। আজ্ঞে হাঁ, আমারই জামাই-ষষ্ঠী। আর-পাঁচজনের মতো জামাই হবার সৌভাগ্য আমারও হয়েছিল। এই সৌভাগ্যের জন্যই প্রতিবৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের এই বিশেষ দিনটিতে নিজেকে গর্বিত ও গৌরবান্বিত বোধ করতাম।

কলকাতায় শ্বশুরবাড়ীতে আছি। শ্বশুরবাড়ীর পাশেই মামা-শ্বশুরের বাড়ী। সেই মামাশ্বশুর বাড়ীর এক জামাই—সম্পর্কে আমার মাসশ্বশুর—আমাকে কি চক্ষেই দেখলেন যে, তাঁর অফুরন্ত স্নেহধারায় আমাকে নিত্য অভিষিক্ত করতে লাগলেন। তাঁর চশমার ব্যবসা ছিল ; বিনামূল্যে চশমার পর চশমা উপহার দিয়েছেন আমাকে। বাড়ী বদলেছি,—নিজের বাড়ী থেকে ভাত-তরকারী প্রভৃতি রান্না ক'রে

নিজে ব'য়ে নিয়ে গিয়ে দিনের পর দিন জোগান দিয়েছেন আমার নতুন বাড়ীতে। মাসশ্বশুরটি সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তি। এখন তিনি বেশ বৃদ্ধ হয়েছেন,—এখনও তাঁর কণ্ঠে সুমিষ্ট সুরের কিঞ্চিৎ ভগ্নাবশেষ বর্তমান আছে। হয়তো এই সঙ্গীতানুরাগই তাঁকে আমার প্রতি স্নেহপরায়ণ ক'রে তুলেছিল।

জামাই-ষষ্ঠী। বাংলাদেশের জামাই-পুঙ্গবদের 'চিরবাঞ্ছিত চিতসঞ্চিত' এই শুভদিনটি সমাগতপ্রায়। পর পর দু'টি বৎসরের এই দিন-দু'টি পার্শ্ববর্তী মামাশ্বশুরের বাড়ীতে নির্বাহিত করেছি। বলা বাহুল্য, আমার স্নেহশীল মাসশ্বশুর মহাশয়ও প্রতিবৎসর জামাই-ষষ্ঠীর দিনে এই বাড়ীতেই নিমন্ত্রিত হ'য়ে থাকেন; কারণ এটি তাঁর সাক্ষাৎ-শ্বশুর-বাড়ী। এবারে কিন্তু মামাশ্বশুরের বাড়ীতে জামাই-ষষ্ঠীতে যোগদান করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হ'লো না। আমার পূজনীয়া শ্বশ্রূমাতা-ঠাকুরাণী পূর্বাহ্ণেই জানিয়ে রেখেছেন যে, এবারে যেন মামাশ্বশুরালয়ে নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করি। কিন্তু শাশুড়ীঠাকুরাণীর সাধে বাদ সাধলেন আমার মাসশ্বশুরটি। তিনি ধ'রে বসলেন, এবারের জামাই-ষষ্ঠীর নৈশ ভোজনটা তাঁর গৃহেই সমাপন করতে হবে। শ্বশ্রূমাতা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন বলো দেখি, তুমি এত জিদ করছো?'

মাসশ্বশুর বললেন, 'একসঙ্গে ব'সে খাবো, এই আর কি?'

শাশুড়ীঠাকুরাণী সম্মত হ'য়ে গেলেন। আমার মাথায় কেবলই ঘুরতে লাগলো ঃ ভদ্রলোক কেন এ-বৎসর জামাই-ষষ্ঠীতে খাওয়ানোর জন্যে এত পীড়াপীড়ি করলেন? ধরে নিলাম, বাড়ীতে গানবাজনার আসর বসবে হয়তো; আরও পাঁচটা জামাই আসতে পারে। মাস-শ্বশুর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কখন যাবো, বলুন তো?'

'সন্ধ্যার সময় যাবেন, আটটা সাড়ে আটটায়।'

'আপনি এবারে আপনার শ্বশুরবাড়ীতে আসবেন না?'

'তা আসবো বৈকি, বেশ একসঙ্গে আমার বাড়ী থেকে আসা যাবে।'

তাঁর শ্বশুরবাড়ী যে আমার বাড়ীর খুবই নিকটে, এ কথা আগেই বলেছি। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বাড়ীতে গান-বাজনার আয়োজন করেছেন নাকি?'

'না, এমন কিছু আয়োজন করিনি। তবে আপনি যদি গাইতে চান তো একটা হারমোনিয়ম না হয় আনিয়ে রাখবো।'

আমি ভদ্রলোকের মনোভাব বুঝেই বললাম, 'না, দরকার নেই ও-সব হাঙ্গামার। এ দিনটিতে বাইরের লোককেও ডাকতে পারবেন না, বাড়ীর মেয়েরাও সব ব্যস্ত থাকবেন। থাক্ গান-বাজনা।'

এবম্বিধ আলাপনাদির পর তিনি আমার কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

তিনশো চৌষট্টিটি বাজে দিনের ভিড় ঠেলে, কলকাতার মেছুনী আর মিষ্টান্ন-বিক্রেতাদের মুখে মিষ্টি হাসি ফুটিয়ে সত্যিই জামাই-ষষ্ঠীর দিনটি এলো। সন্ধ্যার সময় ফরাসডাঙার কোঁচানো ধুতি প'রে, গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবী উত্তমাঙ্গে চড়িয়ে, ফিনফিনে উড়ুনীখানি ফুরফুরে হাওয়ায় উড়িয়ে আদর্শ-জামাতৃরূপে আবির্ভূত হলাম মাসশ্বশুর মহাশয়ের বাড়ীতে। দেখি, সেখানে আরও দু'একটি ব্যক্তি জামাতৃসুলভ বেশভূষায় সজ্জিত হ'য়ে বৈঠকখানা ঘরটি আলো ক'রে ব'সে আছেন। এঁরা বোধহয় একেবারে সাক্ষাৎ-জামাই,—শ্বশুরের সওদা-করা সম্পদ। তা হোক, এঁদের সঙ্গে বেশ আসর জমিয়ে বসলাম। গান-বাজনার বালাই নেই, এ-রকম শুভদিন আমার ভাগ্যে

বড় একটা আসেনি কখনো। সন্ধ্যার সময় পাঁচপদ নেমন্তন্ন খাওয়ালে অথচ দু'পদ গাইয়ে নিলে না, এমনটা খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে।

প্রায় এক ঘণ্টাকাল বেশ গল্পগুজবে কেটে গেল। অতঃপর এক ব্যক্তি এসে তাঁদের সাক্ষাৎ-জামাই দুটিকে খাবার জন্যে পৃথকভাবে নাম ধ'রে ডাকলেন এবং জামাইবাবুদের সঙ্গে নিয়ে অন্তঃপুরে চ'লে গেলেন। আমায় ডাকলেন না ব'লে আমি উঠলাম না। তা ছাড়া, আমি উঠলাম না দেখেও ভদ্রলোক যখন উঠতে বললেন না, তখন নিজে থেকে উঠে খেতে যাওয়াটা কি ভালো দেখায়? আপনারাই বলুন। একা একা ব'সে বড়ই বিড়ম্বিত বোধ করতে লাগলাম। ব'সে থেকেও স্বস্তি নেই, চ'লে যেতেও পারছিনে। লোকটি

আমাকে ডাকতে ভুলে গেল নাকি? কিন্তু তাই বা কি ক'রে হয়? পাঁচ মিনিট উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল, তারা হয়তো খেতে ব'সে গেছে,—এখনও সে ভুলের সংশোধন হ'লো না! ভেবে ভেবে মনটা ক্রমেই বিদ্রোহী হ'য়ে উঠছে। আরও দশ-পনেরোটি মিনিট আমার বুকের উপর দিয়ে দ্রুত পদবিক্ষেপে অতিক্রান্ত হ'য়ে গেল। এমন সময় আমার সেই মাসশ্বশুর মশায় বেশ ফরসা ধুতি-পাঞ্জাবী প'রে এসে আমাকে বললেন, 'চলুন এবারে।'

এই কথা ব'লে তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লেন। আমি তো প্রমাদ গণলাম। কোথায় যাচ্ছি জামাই-ষষ্ঠীর নেমন্তন্ন খেতে? কলেজ স্ট্রীট কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের সংযোগস্থলে এসে তিনি কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের ফুটপাত ধ'রে উত্তরাভিমুখে চলতে লাগলেন। আমি একান্ত অনুগতের মতো তাঁর অনুসরণ ক'রে চলেছি। কিছুক্ষণ চ'লে তিনি কর্নওয়ালিস স্ট্রীট ছেড়ে বাঁদিকে বিবেকানন্দ রোডের পথ ধরলেন। আমার বাড়ী যাবারও এই পথ। আমার বাড়ীর প্রায় কাছাকাছি এসে প'ড়ে যখন আমি মাসশ্বশুর মশায়কে ছাড়িয়ে আমার বাড়ীর দরজার দিকে এগিয়ে চলেছি, তখন তিনি আমাকে বললেন, 'ওকি, এগিয়ে চললেন যে? এ বাড়ী যাবেন না?'

এ বাড়ী অর্থাৎ তাঁর শ্বশুরবাড়ী এবং আমার মামাশ্বশুর-বাড়ী। আমি তাঁকে বললাম, 'সেখানে তো আমার যাবার কথা নয় আজ!'

'তাঁরা বলেননি এবারে?'

'বলেছিলেন,—আমিই অক্ষমতা জানিয়েছিলাম।'

ভদ্রলোক যেন বিব্রত হ'য়ে পড়লেন। চমকে উঠে বললেন, 'অ্যাঃ, এখানে যাবেন না আপনি? আমি ভাবলাম, এখানে একসঙ্গে ব'সে খাওয়া যাবে। এই একসঙ্গে খাবো ব'লেই তো সেদিন আপনাকে

অতো ক'রে ব'লে গেলাম। আহা, আমার বাড়ীতে আপনাকে দুটি খাইয়ে দিলেই হতো! সত্যিই আপনি যাবেন না এ বাড়ীতে?'

'কি ক'রে যাই বলুন, যাবার কথা নয় যে!'

ভদ্রলোক বেশ একটু চিন্তিত হ'য়ে আমাকে বললেন, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান,—কোথায় যেন একটু গণ্ডগোল হ'য়ে গেছে মনে হচ্ছে। আপনাকে সেদিন আমার বাড়ীতে খাবার জন্যে বলেছিলাম, না এ-বাড়ীতে?'

আমি বললাম, 'যাক, ও নিয়ে এখন আর ভেবে লাভ কি?'

'কিন্তু আপনার যে খাওয়া হ'লো না!'

—'ব'লে, তিনি অনুতাপ করতে করতে গৃহাভিমুখে রওনা হলেন। আর আমি।আমার বাড়ীর দরজার কড়া নাড়তে লাগলাম। খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে বাড়ীর সকলেই বোধ হয় এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে।

জামাই-ষষ্ঠীর কথা যখন উঠলো, তখন একটা বিয়ের ব্যাপার বলি। একটি বিয়েতে একটু রসিকতা করতে গিয়ে বড় বিপন্ন হ'য়ে পড়েছিলাম। যাঁদের নিয়ে রসিকতা, তাঁরা নিতান্ত ভদ্রলোক ব'লে দুটো গালমন্দ দিয়েই ছেড়ে দিয়েছিলেন,—তেমন তেমন লোক হ'লে আমার হাড় গুঁড়িয়ে পাঁউডার ক'রে দিত। দোষ আমারই, কারণ রসিকতা সত্যিই মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল, হিসেব ঠিক রাখতে পারিনি।

বন্ধু হরিতারণের বিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার জেমোকান্দিতে। বর নিয়ে বরযাত্রীর দল আমরা বিয়ের আগের দিনে সেখানে পৌছলাম। কন্যাপক্ষ যেমন সাদর অভ্যর্থনা করলেন, তেমনি চূড়ান্ত পরিচয় দিলেন

আতিথেয়তার। আমরাও আমোদ-প্রমোদে মেতে আছি,—গানে বাজনায়, তাসে পাশায়। কন্যাপক্ষের বহু ব্যক্তিও আমাদের আমোদ-প্রমোদে পরম উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। বিয়ের আগেই বেশ একটা অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হ'য়ে গেল কন্যাপক্ষের সঙ্গে।

সন্ধ্যাবেলায় অর্থাৎ রাত্রির প্রথম প্রহরে বিয়ের লগ্ন। সবাই সেজেগুজে বর নিয়ে কনের বাড়ী গেলাম। শঙ্খধ্বনি সহকারে বরকে বরণ ক'রে নিয়ে পুরস্ত্রীরা তাঁদের স্ত্রী-আচারের ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করতে লাগলেন। আমি বরাবরই বরের সঙ্গে আছি। স্ত্রী-আচারের সময় দু'একটি মহিলা আমার উপস্থিতিতে আপত্তি করলেও, অধিকাংশ মহিলাই অনুগ্রহ ক'রে আমার থাকাটা অনুমোদন করলেন। একজন বললেন, 'রাজার সঙ্গে ভাঁড় থাকবে না ?'

বুঝলাম এ মন্তব্য আমার হাসির গানের পরিণাম। যাই হোক, আমাকে যে থাকতে দিলে এবং তাড়িয়ে দিলে না, এতেই আমি খুশী। ভাঁড় কলসী ঘটী যাই বলুক না, তাতে আমার কী আসে-যায় ?

কিছুক্ষণ পরে আরম্ভ হ'লো সপ্ত প্রদক্ষিণ। আমি বরের অনতি-দূরে দাঁড়িয়ে আছি। পিঁড়ির ওপর ক'নেকে বসিয়ে উঁচু ক'রে ধ'রে কন্যাপক্ষের ছেলেরা বরের চারিদিকে ঘুরছে। তারপর হ'লো শুভদৃষ্টি। শুভদৃষ্টির পর মাল্য-বিনিময়। বর ক'নের গলায় আগে একটি মালা পরিয়ে দিলে। তারপর ক'নে অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে অবনত মস্তকে কম্পিত দুটি হাতে মালা ধ'রে বরের গলায় পরাতে উদ্যত হ'লো। আমার মাথায় হঠাৎ কী দুর্বুদ্ধি গজালো, আমি বরের মাথার কাছে আমার মাথাটি এগিয়ে দিলাম ;—আর বরমাল্য পড়লো আমার গলায় !

বিবাহ-সভায় হুলুস্থুল প'ড়ে গেল। এ কি ইয়ার্কি, এ কি

রসিকতা! বৃদ্ধের দল তো ক্ষেপে গেলেন। নানা জনে নানা রকমের মন্তব্য প্রকাশ করতে লাগলো। এমন কি বরপক্ষের কাছ থেকেও

যথেষ্ট গঞ্জনা পেলাম। কী আর করি,—ক'নের দেওয়া মালাটি হাতে নিয়ে চুপ ক'রে এক কোণে দাঁড়িয়ে রইলাম। পরে আর একগাছি মালা এনে ক'নেকে দেওয়া হ'লো, সেইটি ক'নে পরিয়ে দিলে বরের গলায়। তা ছাড়া আর উপায় কি? যার গলায় প্রথমে মালা দিলে, তার।সঙ্গে তো আর বিয়ে হ'তে পারে না!

আর-একবার এক বন্ধুর বিয়েতে বীরভূম জেলার একটি পল্লীগ্রামে বরযাত্রী গেছি। বরযাত্রীর দলে আছেন আমাদের

স্বনামধন্য দাদাঠাকুর ওরফে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়। দাদাঠাকুর একাই একশো। আমাদের বরযাত্রী দলকে হাসিয়ে মাতিয়ে রেখেছেন। দাদাঠাকুরের সম্যক পরিচয় দেবার স্থান এ নয়। ইচ্ছা আছে, তাঁর সম্বন্ধে ভবিষ্যতে বিস্তৃতরূপে আলোচনা করবো। এখানে কেবলমাত্র এইটুকুই ব'লে রাখি, দাদাঠাকুর—দাদাঠাকুর। সারা বাংলাদেশে বোধহয় এই একটিমাত্র সদানন্দ মানুষ শিরদাঁড়া সিধে ক'রে উন্নতমস্তকে আজ তিয়াত্তর বৎসরকাল একভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। বাল্যের পিতৃতুল্য অভিভাবক, একমাত্র পিতৃব্য ছাড়া যাঁর চির-উন্নতশির আর কারও কাছে অবনমিত হয়নি। দুঃখে নিরুদ্বিগ্নমনা এবং সুখে বিগতস্পৃহ এমন আনন্দময় পুরুষ আমাদের দেশে আছে কিনা জানিনে। এহেন দাদাঠাকুরকে সঙ্গে পেয়ে আমরা সারা পথ আনন্দে কাটিয়ে কন্যাপক্ষের বাড়ীতে উপনীত হলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর, কন্যাপক্ষ থেকে জলখাবারের জন্যে আহ্বান এল। ছোট ছোট কলাপাতার টুকরো, তার ওপরে দুটি ক'রে রসগোল্লা। দাদাঠাকুর পাতা দেখেই বলে উঠলেন, 'ওরে, এরা যে বিসর্গ দিল রে, এর পর বুঝি ঘাড় ধ'রে চন্দ্রবিন্দু দ্যায় বা !'

চন্দ্রবিন্দু আমাদের অদৃষ্টে লাভ হয়নি, বরং কন্যাকর্তার ভদ্রতা-সৌজন্যে আমরা অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিলাম। কেবল একটিমাত্র ব্যক্তি আমাদের অস্বস্তির কারণ হয়েছিলেন। তিনি এই বাড়ীরই একটি ঘরজামাই। এই ঘরজামাই-বাবুর 'মারি-তো-গণ্ডার, লুটি-তো-ভাণ্ডার' -গোছের বাহ্বাস্ফোটের সঙ্গে কথার তুবড়িবাজি আমাদের পক্ষে একেবারে অসহনীয় হ'য়ে উঠলো। লোকটিকে জব্দ করবার জন্যে একটি গান লিখলাম। বিয়ের পরের দিন সকালবেলা গানের আসর বসেছে। গ্রামের কয়েকজন সম্মানী ব্যক্তি এসেছেন গান শুনতে।

আমাদের অভীপ্সিত ঘরজামাই-বাবুও রয়েছেন। পর পর কয়েকখানি গুরুগম্ভীর গানের পর আমি হাসির গান আরম্ভ করলাম। দু'একটি হাসির গানের পর গাইলাম সেইদিনের রচিত গানটি—

নতুন সাজে সেজেছি আজ
নতুন সভ্য আমরা।
ইঙ্গ-বঙ্গ-হাম্বারবে
যেন শৃঙ্গবিহীন দামড়া॥
সস্ত্রীক চতুষ্পদে হাঁটি,
অসভ্যতার জাবর কাটি,
সার ক'রেছি নতুন গোয়াল
শ্বশুরবাড়ীর কামরা॥···ইত্যাদি।

ব্যস্, আর যায় কোথা? গুলী ঠিক জায়গায় গিয়ে বিঁধেছে। ক্ষেপে গেলেন জামাইবাবু। আমারই একদিন কি জামাইবাবুর একদিন!

বলা বাহুল্য, নূতন বর-বধূ নিয়ে আমরা অক্ষত দেহে সেখান থেকে রওনা হলাম আর ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে শ্বশুর-বাড়ীতে প'ড়ে রইলেন ঘরজামাই-বাবু।

গুটিকতক সভার কথা বলি। বর্ধমান জেলার কাটোয়ায় স্বর্গত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিসভা। কবিবন্ধু বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করতে সেখানে গেলাম। অনুষ্ঠানটির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী, আর অভ্যর্থনা-কমিটির সভাপতি ছিলেন অগ্রজ-প্রতিম কবি শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক। কলকাতা থেকে কোনো কাজের ভার নিয়ে আমি কাটোয়ায় আসিনি,

—না বক্তৃতা, না আবৃত্তি, না গান। কেবল কলকাতার বাবুদের সংখ্যাবৃদ্ধি করবার জন্যেই আমার সেখানে যাওয়া। পরের খরচায় সাহিত্যিক বন্ধুদের সৎসঙ্গে রেলগাড়ীতে চ'ড়ে একটু ঘুরে আসা ;—মন্দ কি ? কিন্তু বরাতও চললো সঙ্গে সঙ্গে।

কাটোয়ায় পৌঁছনো মাত্র আমার ওপর হুকুম হ'লো সভাক্ষেত্রে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি হাসির গান গাইতে হবে। ইন্দ্রনাথের একটিমাত্র হাসির গান সেকালে চালু ছিল—'বেঘোরে বেহারে চড়িনু এক্কা।' সেইটাই গাইবো ঠিক করলাম।

অপরাহ্ণে সভার অধিবেশন আরম্ভ হ'লো। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী যথারীতি অভিনন্দিতা, প্রস্তাবিতা, অনুমোদিতা ও সমর্থিতা হ'য়ে সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করলেন। সভানেত্রীর ঘোষণাক্রমে সাহিত্যিকেরা পাঠ করলেন আপন আপন প্রবন্ধ ও কবিতা। ওরই এক ফাঁকে আমি গাইলাম ইন্দ্রনাথের 'বেঘোরে বেহারে চড়িনু এক্কা'। আমার গানের পর আবার চললো বক্তৃতাদির পালা। কয়েকটি বিষয়ের পরে সভানেত্রী আমাকে অনুরোধ করলেন আমার স্বরচিত 'পত্নী-প্রতিযোগিতা' বা 'যদু-মধু সংবাদ' গানটি গাইবার জন্যে। কলকাতার একাধিক অনুষ্ঠানে অনুরূপা দেবীর অনুরোধে এ-গানটি আমাকে বহুবার গাইতে হয়েছে। হয়তো গানটি তাঁর ভালো লেগেছিলো। কিন্তু তাঁর ভালো লেগেছে ব'লে সবারই যে ভালো লাগবে, বিধাতাপুরুষ এমন কোনো ব্যবস্থা করেননি।

গানটি গাইতে আরম্ভ করলাম। দু'-চারটি কলি গেয়েছি, এমন সময় দর্শকদের আসন থেকে একজন মুণ্ডিতমস্তক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হ'য়ে ঝোঝুল্যমান শিখাটিকে চাড়া দিয়ে ঊর্ধ্বফণ ক'রে তুলে, রসনায় পঞ্চতিক্ত কষায় লেপন ক'রে আমার উদ্দেশে শাসন-বাক্য প্রয়োগ

করতে লাগলেন। তাঁর অভিযোগ—ইন্দ্রনাথ ছাড়া অন্যের রচিত গান এখানে চলবে না। চললোও না। আমি মান খুইয়ে এবং প্রাণ বাঁচিয়ে আস্তে আস্তে স'রে পড়লাম সভাক্ষেত্র থেকে। কি জানি কি হয়, বলা যায় না। সভানেত্রীর আদেশে যদিও আমি গানটি গেয়েছি, কিন্তু তিনি নারী—অবধ্যা। নর হ'য়েই যে আমি ফ্যাসাদে পড়েছি! যাই হোক, কায়ক্লেশে পৈতৃক প্রাণটা রক্ষা ক'রে তল্পিতল্পা গুটিয়ে সটান চ'লে এলাম রেলওয়ে স্টেশনে। স্টেশনে এসে দেখি, কলকাতার গাড়ী আসতে অনেক দেরি। ওভার-ব্রিজের ওপর একটি প্রায়ান্ধকার স্থানে একাকী ব'সে রইলাম। মনের মধ্যে নানা চিন্তা খেলতে লাগলো। মনে হ'লো—আমরা রাগি কেন, রেগে লাল হই কেন, রাগলে প্রতিপক্ষকে খিঁচিয়ে উঠিই বা কেন? প্রশ্নের উত্তরও জাগলো মনের মধ্যেঃ আমাদের পূর্বপুরুষেরা সহজেই ক্রোধোদ্দীপ্ত হ'য়ে লাঙ্গুল উত্তোলনপূর্বক সকলকে খিঁচোতেন, তাই আমরাও খিঁচোই। বিবর্তনের ফলে আমাদের ন্যাজটি খসেছে মাত্র আর কিছুরই পরিবর্তন হয়নি। রাগলে আমাদের মুখমণ্ডল কপ্যাস্যং হ'য়ে ওঠে। তাঁরা অনেক উচ্চ স্তরে থাকেন এখনও, আমাদের দৌড় বড়জোর ওভার-ব্রিজ পর্যন্ত। এই সব এলোমেলো চিন্তায় মনটা ঘোলাটে হ'য়ে আছে, এমন সময় বন্ধুবর বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এসে উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার অদৃষ্টে আবার কি হ'লো?'

উত্তেজিত কণ্ঠে বসন্তকুমার বললেন, 'একজনের অপমানে সবাইকার অপমান। এক মুহূর্ত আর সেখানে থাকতে ইচ্ছে হ'লো না। চ'লে এলাম। হাতে-পায়ে ধ'রে ঘরে ডেকে এনে অপমান করলে এরা!'

দুটি বন্ধুতে দু'জনের গলা জড়িয়ে দুঃখের কান্না কেঁদে সদ্যসন্তপ্ত অপমানের জ্বালা জুড়োচ্ছি, এমন সময় সেখানে অকস্মাৎ আবির্ভূত

হলেন আমাদের কুমুদ-দা—কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক। মাটির মানুষ কুমুদ-দা—কত অনুনয়-বিনয়, কত সাধ্য-সাধনা ক'রে আমাদের অনুরোধ করলেন আবার সভামণ্ডপে ফিরে যেতে। কিন্তু আমাদের অন্তরের ঝটিকার প্রবল ফুৎকারে কুমুদ-দা'র সব কথাই উড়ে গেল। তিনি নিতান্ত ক্ষুণ্ণ মনে শ্লথ পদে সেখান থেকে চ'লে গেলেন।

হাসির অন্তরালের ঝাঁপি খুঁজতে গিয়ে কাটোয়ার সভার কথা মনে জেগে উঠলো। কিন্তু তারা যে অপমান করেছিল তার কোনো চিহ্নই নেই মনের মধ্যে, সেস্থানে জ্বলজ্বল করছে আমারই অপরাধের অত্যুগ্র মূর্তি। কুমুদ-দা'কে উপেক্ষা ক'রে যে অপরাধ করেছিলাম, আজ এতদিন পরে সর্বজনসমক্ষে তাঁর কাছে কৃতাঞ্জলি হ'য়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

আমাদের কালে যে-সব মনীষী বাংলার পল্লী-প্রাণকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে স্বর্গত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের দান অপরিসীম। বৃটিশ-রাজের আই. সি. এস. কর্মচারী হ'য়েও তিনি বাঙালীর মনে সাহস ও দেহে শক্তি সঞ্চারের জন্যে জীবনের শেষার্ধ কাল অক্লান্ত পরিশ্রমে অতিবাহিত ক'রে গেছেন। পুণ্যবতী পত্নী সরোজনলিনীর মহাপ্রয়াণের পর এই মহান কর্মের ভিতর দিয়েই তিনি জায়া-বিয়োগজনিত শোকে সান্ত্বনা লাভ করতেন। 'সরোজনলিনী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি' আজ গুরুসদয় দত্তের কর্মিষ্ঠতার অন্যতম সাক্ষ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। দেশের যুবশক্তি জাগরণের জন্যে তিনি ব্রতচারী অনুষ্ঠানে রায়বেঁশে নৃত্য, লাঠি-চালনা প্রভৃতির পুনঃপ্রচলন প্রচেষ্টা করেছেন প্রায় সমগ্র বাংলাদেশে। পদস্থ রাজপুরুষ হ'য়েও

অতিসাধারণ ব্যক্তিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে তিনি স্বয়ং নৃত্য-গীত ও ব্যায়ামাদি করেছেন। এ মহৎ দৃষ্টান্ত বাংলাদেশে বিরল।

একবার গুরুসদয়বাবু এলেন হাওড়ায়, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হ'য়ে। সে সময় শালকেতে 'গোবর্ধন নাট্য ও সাহিত্য সমাজ' ব'লে একটি সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠান ছিল। প্রতিষ্ঠানটির স্থায়ী সভাপতি ছিলেন প্রবীণ সাহিত্যিক জলধর সেন মহাশয়। একদিন শ্রীজলধর সেন স্বাক্ষরিত একখানি পত্র পেলাম,—গোবর্ধন নাট্য ও সাহিত্য সমাজে গুরুসদয়বাবুর সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়েছে, তারই নিমন্ত্রণ-পত্র এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে সেই অনুষ্ঠানে দু'একটি হাসির গান গাইবার জন্যে।

ঠিক দিনটিতে সন্ধেবেলায় শালকের ঢ্যাং মহাশয়ের ভবনে উক্ত অনুষ্ঠানে হাজির হলাম। বহু লোকের সমাগম হয়েছে সেখানে। একে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট, তার ওপর দেশহিতব্রতী। একটি প্রকাণ্ড হলে সভার অধিবেশন। দুইখানি চেয়ারের উপর জলধরবাবু ও গুরুসদয়বাবু ব'সে আছেন। সম্মুখে টেবিল। হলের মেঝেয় ফরাস পাতা,—সেখানে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী ব'সে আছেন। আর হলের একটি কোণে, টেবিল-চেয়ারের অনতিদূরে চারটি অবগুণ্ঠনবতী বর্ষীয়সী মহিলা পর পর পরস্পরের দিকে মুখ ক'রে নিতান্ত জড়োসড়ো হ'য়ে বৃত্তাকারে ব'সে আছেন। দেখলেই মনে হয়, এই প্রৌঢ়া পুরমহিলা কয়টিকে সম্পূর্ণ অনিচ্ছাক্রমেই যেন এখানে আসতে হয়েছে।

সভা আরম্ভ হ'লো। গুরুসদয়বাবুকে মাল্যদান ও উদ্বোধন সঙ্গীতের পর জলধর সেন মহাশয় দাঁড়িয়ে উঠে বলতে আরম্ভ করলেন, 'আজ এই মহাপুরুষের সম্বর্ধনার আয়োজন করেছি আমরা এখানে। কেন করেছি? তিনি যে একজন প্রবল-প্রতাপান্বিত আই. সি. এস.

সেজন্যও নয়, তিনি যে হাওড়া জেলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা সে জন্যেও নয়, —তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক, এইজন্যেই আজ আমরা তাঁর সম্বর্ধনার আয়োজন করেছি। (এর স্বল্পকাল পূর্বে গুরুসদয়বাবুর প্রথম বাংলা বই 'ভজার বাঁশি' বাজারে বেরিয়েছে)। আর…'

—বলতে বলতে জলধর-দা'র কণ্ঠস্বর নেমে এল, সে-স্বর কিঞ্চিৎ কম্পিত হ'লো, দাদার চক্ষু দু'টিও মনে হ'লো ছলছল। দাদা বলতে আরম্ভ করলেন, 'আর, আজ যদি তাঁর পার্শ্বে সেই প্রাতস্মরণীয়া, সেই পুণ্যবতী মহীয়সী নারী উপস্থিত থাকতেন…'

জলধর-দা'র মুখের কথা মুখেই রইলো। পত্নীপ্রাণ গুরুসদয়বাবু তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হ'য়ে বললেন, 'জলধরবাবু, তিনি আছেন, তিনি আছেন…'

আর যায় কোথা! এবার জলধর-দা'ও গুরুসদয়বাবুর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তদ্গতচিত্তে, কম্পিত কণ্ঠে, গদগদভাষণে বলতে লাগলেন, 'সেই পুণ্যবতী নারী সশরীরে এখানে উপস্থিত নাই বটে, কিন্তু তিনি এই মহাত্মার অন্তরের অন্তস্তলে অবস্থান ক'রে আমাদের ক্রিয়াকলাপ সমস্তই নিরীক্ষণ করছেন। তাঁর শুভেচ্ছা মাথায় পেতে আমরা আমাদের গন্তব্য পথে অগ্রসর হচ্ছি।'

—ইত্যাদি সুযুক্তিপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতার পর জলধর সেন মহাশয় উপবেশন করলেন। তারপর উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর বক্তৃতা ও গায়ক-গায়িকাদের গান হ'লো। সর্বশেষে আমি কয়েকটি হাসির গান গাইলাম। আমার গানের পরই উঠলেন গুরুসদয়বাবু তাঁর ভাষণ দিতে। প্রথমেই তিনি বললেন, 'আমি অনেক সভায় যোগদান করেছি, অনেক সভায় সভাপতিত্ব করেছি, কিন্তু এমন সুপবিত্র আদর্শ

সভা আর কোথাও দেখিনি। কারণ, এই সভাকক্ষে এই যে এতগুলি যুবক একত্র হয়েছেন, আমি দেখতে পাচ্ছি—এঁরা প্রত্যেকে চরিত্রবান।'

—এই পর্যন্ত ব'লে তিনি সেই কোণঠাসা চারটি ব্রীড়াবনতা প্রৌঢ়ার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ ক'রে বললেন, 'এই সভার যুবকেরা প্রত্যেকে চরিত্রবান। কারণ, এই যে চারটি মহিলা এখানে ব'সে আছেন, কারুর কুদৃষ্টি তো এঁদের ওপর পড়ছে না। কুদৃষ্টি পড়ছে না, কারণ এই সব যুবকদের কারুর মধ্যেই 'কু' নাই।'

মহিলা চারটি আরো জড়োসড়ো হ'য়ে পরস্পরের গা ঘেঁষে চতুর্মুখ ব্রহ্মার মতো যেন এক-অঙ্গ হ'য়ে গেলেন। গুরুসদয়বাবুর ভাষণ চললো, 'জাতির মধ্যে চরিত্র জেগেছে কিন্তু তার প্রাণে আনন্দ জাগেনি, বাহুতে শক্তি জাগেনি। সেই আনন্দের উদ্বোধন করতে হবে, সেই শক্তিকে জাগ্রত করতে হবে। এইমাত্র হাসির গান হ'য়ে গেল, আপনারা হাসলেন, ক্ষণিকের আনন্দে উৎফুল্ল হলেন। এই আনন্দকে চিরস্থায়ী করতে হবে। আর তা করতে হ'লে শুধু গান করা নয়—নাচতে হবে। দু'চারজন নয়,—সমগ্র জাতিকে নাচতে হবে। আজ আমরা সকলে নাচবো।'

তারপর আমার দিকে নৃত্যভঙ্গি-সহকারে চেয়ে বললেন, 'নাচের গান বাজান হারমোনিয়মে, আমরা সকলেই আজ নাচবো। উঠুন জলধরবাবু।'

—ব'লে, বৃদ্ধ জলধর সেন মহাশয়ের হাত ধ'রে টেনে তুললেন তিনি। জলধর সেন মহাশয় উঠে দাঁড়ালেন বটে, কিন্তু প্রকাশ্য সভায় অতো লোকের মধ্যে নাচতে সঙ্কোচ বোধ করলেন। আর সেই প্রৌঢ়া পল্লীনারীদের যে কী অবস্থা হ'লো, তা সহজেই অনুমেয়।

হায়, সেদিন যদি জলধর-দা এক কদম নাচতেন! গুরুসদয়বাবুর সে সাধু প্রস্তাব আমরা কেহই গ্রহণ করিনি। হয়তো সেই কারণেই স্বাধীনতা লাভ ক'রেও আমরা নিরানন্দে দিন যাপন করছি! নিজেরা তামসিক হ'য়ে আছি, গুরু সদয় হ'লেই বা কি হবে?

আর একটি সভা: ঐ হাওড়াতেই একজন রায়বাহাদুর উপাধি-ধারী সারস্বত ব্যক্তি সভাপতি-পদে বৃত হয়েছেন। আমার গান গাইবার পালা। কতকগুলো কুচো বক্তৃতার পর সভাপতি রায়-বাহাদুর উঠলেন তাঁর ভাষণ দিতে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে প্রাচীন যুগের বহু উদ্ধৃতি সহযোগে অনেক মূল্যবান কথা ব'লে মধ্যযুগের কথা পেড়ে আধুনিক যুগে এলেন। তিনি বললেন, 'সাহিত্যই জাতির প্রাণ, সাহিত্যই জাতি সৃষ্টি করে। আজ যে বাংলাদেশে জাতীয় জাগরণ আসিয়াছে, তাহার মূলে আছে বাংলা-সাহিত্য। এই সাহিত্যের প্রেরণাতেই বাংলাদেশের তরুণেরা হাসিমুখে ফাঁসিকাঠে গলা বাড়াইয়া দিতেছে।'

—কথা ক'টি ব'লেই তাঁর সম্বিৎ জেগেছে—গেল বুঝি খেতাব, হ'লো বুঝি জেল, ধরলো বুঝি পুলিশ। তখন 'হাসিমুখে ফাঁসিকাষ্ঠে গলা বাড়াইয়া দিতেছে' বলার সঙ্গে সঙ্গেই বলতে আরম্ভ করলেন খুব চেঁচিয়ে, 'কিন্তু এ পথ সত্য পথ নয়, সাহিত্যের পথই সত্য পথ। দেশের তরুণেরা ভুল পথে ছুটিয়াছে। দেশকে বাঁচাইতে হইলে, দেশকে স্বাধীন করিতে হইলে ঐ ভুল পথ ছাড়িয়া সাহিত্যের পথই ধরিতে হইবে।'

এই এক কথা বার বার ব'লে নিজের ত্রুটির সংশোধন ক'রে ব'লে

পড়লেন। আমি সমাপ্তি-সঙ্গীতটি গাইবার উদ্যোগ করছি, এমন সময় আবার তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, 'এই সভায় এমন একজন উপস্থিত আছেন, যাঁহার সম্বন্ধে কিছু না বলিলে আমাকে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হয়। তিনি হইতেছেন শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী। বহুকাল পূর্বে আমি একদিন থিয়েটার দেখিতে গিয়া অভিনেতৃবর্গের চিৎকারে সেই-যে প্রেক্ষাগৃহ হইতে পলাইয়া আসিয়াছিলাম, আর কখনও ও-পথ মাড়াই নাই। সম্প্রতি আমার পুত্র জিদ ধরিয়া বসিল যে, একবার শিশিরকুমার-প্রযোজিত 'সীতা' নাটকের অভিনয় দেখিতে হইবে। নিতান্ত অনিচ্ছায়, পুত্রের অনুরোধে গেলাম 'সীতা' দেখিতে। কিন্তু গিয়া কী দেখিলাম! যতক্ষণ দেখিলাম, যেন রামরাজ্যে বিচরণ করিলাম। আহা, শিশিরকুমার কী অভিনয়ই করিলেন! এরূপ বাস্তব অভিনয় যে হইতে পারে তাহা কল্পনাও করিতে পারি নাই। লবের সহিত রামের সাক্ষাৎকারের দৃশ্যটির যে বাস্তব রূপ শিশিরকুমার প্রস্ফুটিত করিলেন, তাহা একমাত্র শিশিরকুমারের পক্ষেই সম্ভব। রামরূপী শিশিরকুমার যখন স্নেহভরে লবের গণ্ডদেশে করস্পর্শ করিলেন, তখন বাস্তবিকই মনে হইল যেন গাভী তাহার বৎসটিকে লেহন করিতেছে।'

কলকাতায় অনেকগুলি জেলা-সম্মিলনী সেকালে ছিল এবং এখনও আছে। এক জেলার যত সব বাসিন্দা একত্র হন অন্ততঃ বৎসরে একটি দিন। বাংলাদেশের কোনো একটি জেলার কলকাতাস্থ অধিবাসীরা এইরূপ একটি সম্মিলনীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে তাঁদের প্রাথমিক সভার আয়োজন

হ'লো। আমাকে তাঁরা নিয়ে গেলেন সেই সভায় গান গাইতে। একটি রবিবারের অপরাহ্ণে সভা। হলটি ভর্তি। সেই জেলার একজন প্রকাণ্ড ধনী জমিদার সভাপতিরূপে মনোনীত হয়েছেন। যথারীতি সভা আরম্ভ হ'লো। আমি উদ্বোধন সঙ্গীত গাইলাম। সেই ধনী ব্যক্তি সভাপতি-পদে বৃত হ'লেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় দাঁড়িয়ে উঠে বলতে আরম্ভ করলেন, 'একই জেলার অধিবাসী আমরা আজ এখানে মিলিত হয়েছি। বাংলাদেশের অনেকগুলি জেলা-সম্মিলন এখানে রয়েছে, কেবলমাত্র আমাদেরই ছিল না। আজ আমরা এই মিলন-প্রতিষ্ঠান গড়তে উদ্যত হ'য়েছি। এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান পরিচালিত করতে হ'লে কতকগুলি নিয়ম-কানুনের ভেতর দিয়ে চলতে হয়। আমি সেই নিয়মাবলী রচনা ক'রে এনেছি, সেইটি আপনাদের শোনাই।'

হঠাৎ একটি স্বল্পবয়স্ক তরুণ সভামণ্ডপের মাঝখান থেকে দাঁড়িয়ে সভাপতিকে উদ্দেশ ক'রে বললে, 'আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। আমার জিজ্ঞাস্য, আপনাকে এই নিয়মাবলী রচনা করবার অধিকার কে দিয়েছে ?'

বাংলাদেশের এই সর্বজনমান্য ব্যক্তিকে, একটি জেলার মহা-প্রতাপশালী জমিদারকে যে সেই জেলারই একজন বালখিল্য ব্যক্তি এরূপ প্রশ্ন করতে পারে, এটা একেবারে অপ্রত্যাশিত।

সভাপতি মহাশয় সেই তরুণের প্রতি সম্বোধন ক'রে বললেন, 'তুমি আগে নিয়মাবলী শোনো। এতে আপত্তিজনক কিছুই নেই। বরং যা আছে, তা তোমাদের ভালোর জন্যেই।'

ছেলেটি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে আবার বললে, 'ভালো-মন্দের কথা নয়,—কথা হচ্ছে অধিকার-অনধিকারের। আমার মনে হয়, যে-কাজ

আপনি করেছেন, সেটি আপনার একার কাজ নয়। কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হবার পর, তাদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে অধিকাংশ সদস্যের সম্মতি নিয়ে নিয়মাবলী রচিত হওয়া উচিত। সুতরাং ওটি এখন পড়বেন না।'

সভাপতি মহাশয়ের একজন কর্মচারী চেঁচিয়ে ব'লে উঠলেন, 'ছেলেটিকে বসিয়ে দাও।'

ব্যস্, যায় কোথা। ছেলেটির সমর্থকের দল গেল ক্ষেপে। হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড! উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাধবার উপক্রম। আঁতুড়-ঘরেই এই সম্মিলনের অবশ্যম্ভাবী পরিণামের জন্য আতঙ্কিত হ'য়ে একজন আমার কাছে এসে বললেন, 'মশায়, এই সময় একটা গান ধরুন না।'

আমি বললাম, 'এই হট্টগোলের মধ্যে গান গাইবো কি মশায়?'

স্বয়ং সভাপতি মহাশয় নিতান্ত বিনয়-নম্র বচনে বললেন, 'আপনি একটা গান করুন, নইলে গোল যে থামে না—'

—এই কথা ব'লেই সভাপতি মহাশয় তারস্বরে চিৎকার ক'রে বললেন, 'এবারে ইনি একটি গান করবেন।'

বাধ্য হ'য়ে আমাকে উঠতে হ'লো। হারমোনিয়মটি সভাপতি মহাশয়ের টেবিলের ওপরেই রক্ষিত ছিল। সেইখানে, ঠিক সভাপতি মহাশয়ের বাঁ পাশটিতে দাঁড়িয়ে আমি একটি গান গাইতে আরম্ভ করলাম,—একটি বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত। কিন্তু তাতেই কি গোল থামতে চায়? হঠাৎ গানের সুর শুনতে পেয়ে কোলাহলকারীদের মনোযোগ এদিকে একটু আকৃষ্ট হ'লো বটে, কিন্তু গোল থামতে একটু সময় নিল। গানটির দ্বিতীয় কলিতে নিস্তব্ধ হ'লো হলটি। আমি প্রাণপণে চেঁচিয়ে গেয়ে চলেছি। এমন সময় আমার জামার

পিছনদিকে একটি হ্যাঁচকা টান মেরে সভাপতি মহাশয় বললেন, 'আপনি এখন বসুন।'

আমি সে কথায় কর্ণপাত না ক'রে গেয়ে চলেছি। আবার জামা ধ'রে টান।

'আরে মশায়, গোল থেমে গেছে, আপনি এখন বসুন।'

দারুণ বিরক্তির সঙ্গে অর্ধপথে গান থামিয়ে হারমোনিয়মটি ঠেলে দিয়ে আমি মঞ্চ থেকে নেমে পড়লাম। শ্রোতাদের মধ্যে আবার কলরব উঠলো। একজন বললো, 'গান বন্ধ হ'লো কেন? গান থামালেন কেন মশায়?'

সভাক্ষেত্র থেকে সভাপতি মহাশয় প্রস্থান ক'রে আত্মরক্ষা করলেন।

কলকাতার কুড়ি-পঁচিশ মাইল দূরবর্তী একটি শহরতলি থেকে একজন ভদ্রলোক এসে আমার কাছে একদিন একটি অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব করলেন ঃ তাঁদের একটি বড় লাইব্রেরী আছে, প্রতি বৎসরে সেই লাইব্রেরীর সাম্বৎসরিক অধিবেশন হ'য়ে থাকে, বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি যোগদান করেন সেই অনুষ্ঠানে, কলকাতার বিশিষ্ট সাহিত্যিকরা সভাপতির পদ সমলঙ্কৃত করেন—ইত্যাদি ব'লে তিনি তাঁদের গত বৎসরের বার্ষিক বিবরণীর ছাপানো পুস্তিকা একখানি আমাকে দিলেন। অতঃপর জানালেন, এবারের অনুষ্ঠানে তাঁদের কার্যনির্বাহক সমিতি আমাকে সভাপতি নির্বাচিত করেছেন। সব শুনে আমি তাঁকে বললাম, 'আমাকে সভাপতি করবার খেয়াল আপনাদের কেন হ'লো বলুন তো? আমি তো সাহিত্যিক নই।'

ভদ্রলোক নানাবিধ সাক্ষ্য-প্রমাণাদির উল্লেখ ক'রে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করলেন যে, আমি সাহিত্যিক। আমি তাঁকে বললাম, 'এখনো তো বড় বড় সাহিত্যিক অনেক বাকি আছে, সেগুলো শেষ হ'লে পর আমার কাছে আসবেন।'

ভদ্রলোক না-ছোড়-বান্দা। তাঁর নির্বন্ধাতিশয্যে আমাকে নিমরাজী হ'তেই হ'লো। আমি বোকাঝোকা মনিষ্যি হ'লেও এক এক সময় কিরকম ক'রে বুদ্ধি একটু খুলে যায়। ভদ্রলোকটিকে বললাম, 'সভাপতি হবো মশায়, কিন্তু সে-সভায় আমি গান গাইবো না।'

তিনি বললেন, 'তা কি হয়, আপনাকে পেলে তারা কি না-গাইয়ে ছাড়বে?'

আমি বললাম, 'সভাপতি হ'য়ে গান ক'রবো কি মশায়? আজ

পর্যন্ত শুনেছেন, কোনো সভায় কোনো সভাপতি গান গেয়েছে? এই যে, আপনাদের বার্ষিক বিবরণীতে দেখলাম, জলধর সেন, নরেন্দ্র দেব প্রভৃতি সভাপতি হ'য়েছিলেন—এঁরা কি গান গেয়েছিলেন?'

'তাঁরা তো গাইতে পারেন না।'

এবার আমি তাঁকে সুস্পষ্ট ভাষায় আমার মনোগত ভাবটি জানালাম। বললাম, 'আপনারা জানেন বোধ হয় যে, গান আমার উপজীবিকা; গান করতে হ'লে আমি টাকা নিয়ে থাকি। কাজেই নিতান্তই যদি আমাকে গাইতে হয়, টাকা দিতে হবে মশায়,—সভাপতি হই বা না-হই।'

ভদ্রলোক চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন। সভাপতির টোপ গিলিয়ে আমাকে গানের বঁড়শিতে বিদ্ধ করা গেল না দেখে একটু অপ্রস্তুতও হলেন বোধহয়। তারপর আমার গানের জন্যে দেয় দক্ষিণার কথাটাও মুখ-ফুটে ব'লে ফেললাম। কিছুক্ষণ অনুরোধ-উপরোধের টানা-পোড়েনের পর ভদ্রলোক শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন টাকা দিতে; আমিও রাজী হলাম সভাপতি হ'তে।

নির্দিষ্ট দিনে তাঁরা মোটরে ক'রে কলকাতা থেকে আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁদের লাইব্রেরীতে। সন্ধ্যার সময় সভা আরম্ভ হ'লো। যথারীতি সভাপতি-বরণ, বার্ষিক-বিবরণী পাঠ, সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর ভাষণ হ'য়ে গেল। এবারে সভাপতির অভিভাষণ। আমি সমবেত মহিলা ও ভদ্রমহোদয়দের সম্বোধন ক'রে বললাম, 'আপনাদের সভার কার্য তো প্রায় শেষ, বাকী শুধু আমার বক্তৃতা আর সভাপতিকে ধন্যবাদ। ঐ মামুলি ধন্যবাদটা বাদই যাক। আর সভাপতির বক্তৃতায় কতকগুলি বাঁধা-বুলি শুনে আপনারা কী করবেন? যদি নিতান্ত শুনতে চান, তাহ'লে আপনাদের লাইব্রেরীর কর্মকর্তাদের সুখ্যাতি

ক'রে দু'চারটে কথা বলতেই হয়। এখানে আজ আবার এঁরা আমার গানেরও ব্যবস্থা করেছেন। গান গাইবার আগে সভাভঙ্গ করতে হয়। এখন বলুন বক্তৃতা শুনবেন, না, গান ?'

শ্রোতারা বোধ হয় একটুতেই সভাপতির বাগ্মিতার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল! তাই সকলে সমস্বরে ব'লে উঠলো, 'গান, গান।'

আমি ঘোষণা করলাম, 'সভাভঙ্গ হ'লো।'

সভাভঙ্গের পর বসলো হাসির গানের আসর। প্রথম দৃশ্যে সিংহাসনে ব'সে যিনি রাজার পার্ট প্লে করেছিলেন, দ্বিতীয় দৃশ্যে তিনি অবতীর্ণ হলেন ভাঁড়ের ভূমিকায়। শেষের মিলনাত্মক দৃশ্যটি বড়ই মনোমদ—ভোজন এবং ভোজন-দক্ষিণা। ভাঁড়ের বায়না চুকিয়ে দিয়ে তাঁরা সভাপতিকে সসম্মানে মোটরে ক'রে কলকাতায় পৌঁছে দিলেন।

হরেক রকম আসরে রকমারি কাণ্ড। একদিন একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর অগ্রজ এলেন আমার বাড়ীতে। বন্ধুর দাদা ব'লে আমিও তাঁকে দাদা ব'লেই ডাকতাম। দাদা খুব স্নেহপরায়ণ। তাঁর সহোদরের মতো আমাকেও তিনি 'তুই' সম্বোধন করতেন। মফস্বলের একটি জেলায় দাদা জজ-আদালতে ওকালতি করেন। সেই শহরের তিনি একজন প্রভাবশালী, জনপ্রিয় ব্যক্তি। দাদা আমাকে সেদিন বললেন, 'ভাই, অনেক দিন পরে তোর সঙ্গে দেখা। একটা জরুরী কাজে এসেছি। আমাদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এস. এন. রায়ের বিদায়-অভিনন্দন। তোকে যেতে হবে ভাই!'

দাদাই এই অনুষ্ঠানের প্রধান পাণ্ডা। একটা ভালো রকমের দক্ষিণা দেবার দাক্ষিণ্য দেখিয়ে, অনুষ্ঠানের তারিখ ও সময় জানিয়ে

দাদা প্রস্থানোদ্যত হলেন। যাবার সময় যাতায়াতের রেলভাড়া, শিয়ালদহ স্টেশন পর্যন্ত ট্যাক্সিভাড়া ইত্যাদি দিয়ে দাদা তাঁর নিজের মোটরে ক'রে চ'লে গেলেন।

প্রায় এক সপ্তাহ পরে আমি যথাস্থানে গিয়ে উপনীত হলাম। দেখি, একটি শস্পাস্তীর্ণ প্রান্তরে বৈকালিক চা-পানাদির বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। চারধারে চারখানি চেয়ার আর মাঝে একটি ছোট টেবিল সাজিয়ে এক-একটি চক্র। এইরূপ প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি চা-চক্রে স্থানটি পূর্ণ। আমি সেখানে গিয়ে একখানি চেয়ারে ব'সে পড়লাম। কর্মব্যস্ত দাদা দূর থেকে দেখতে পেয়ে দ্রুতবেগে আমার কাছে এসে বললেন, 'এসেছিস ভাই! একটু চা খেয়ে নে। পাঁচটায় গান। এখনো আধ ঘণ্টা দেরি।'

দাদা শশব্যস্ত হ'য়ে অন্য কাজে চ'লে গেলেন। আমি ব'সে রইলাম চায়ের আশায়। মিনিট দশেক কেটে গেল। ক্রমে আরও তিনজন ভদ্রলোক এসে বাকি তিনখানা চেয়ারে বসলেন। কিছুক্ষণ পরে উর্দিপরা একটি 'বয়' ট্রেতে ক'রে সাজিয়ে নিয়ে এল প্রত্যেকের জন্যে এক এক পেয়ালা চা আর এক এক প্লেট খাবার। আমি চায়ের পেয়ালাটি সবে মুখে তুলেছি, এমন সময় দাদা হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে আমার কাছে এসে বললেন, 'চল ভাই, পাঁচটা বাজতে মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি। পাংক্চুয়ালি পাঁচটাতেই গান আরম্ভ করতে হবে।'

'দাঁড়ান, চা-টা খেয়ে নিই।'

দাদার আর তর সইলো না। ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে বললেন, 'আরে কতো চা খাবি তুই, খাস পরে। গানটা আগে হয়ে যাক্।'

ভরা কাপ, ভরা প্লেট টেবিলের শোভাবর্ধন করতে লাগলো, আমি খালি পেটে চললাম দাদার সঙ্গে। দাদা আমাকে হিড়হিড় ক'রে

টেনে নিয়ে চললেন প্রান্তরের এক প্রান্তে। সেখানে শামিয়ানা খাটিয়ে প্রকাণ্ড একটি প্যাণ্ডেল তৈরী করা হয়েছে। মোটা কাপড়ের পাঁচিলে চতুর্দিক ঘেরা। ভিতরে বিরাট মণ্ডপ। সেই মণ্ডপে তিন-চারশো লোকের বসবার ব্যবস্থা। প্রতি সারিতে পনেরো-বিশখানি চেয়ার,—এইরূপ অনেকগুলি সারি। সম্মুখে একটি মঞ্চ। মঞ্চের উপরেও চেয়ার সুসজ্জিত। আর সেই মঞ্চের অনতিদূরে একটি প্রকাণ্ড ঘড়াঞ্চি। দশ-বারো ফুট উঁচু। সেই ঘড়াঞ্চির মাথায় রঙিন আসনের ওপর একটি হারমোনিয়ম বসানো রয়েছে। ঘড়াঞ্চির ওপরে হারমোনিয়মের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ ক'রে দাদা আমাকে বললেন, 'ওঠ্ ভাই!'

আমি বললাম, 'কোথায়?'

দাদা আবার আগেকার মতো শূন্যে অঙ্গুলি উত্তোলন ক'রে বললেন, 'ঐ ওখানে।'

আমি প্রমাদ গণলাম! বললাম, 'সে কি দাদা, ঐ দু'মানুষ উঁচু ঘড়াঞ্চির ওপরে ব'সে গান? ওখান থেকে গাইবো কি?'

দাদা কৃতিত্বব্যঞ্জক উৎসাহভরে বললেন, 'এ ব্যবস্থা আমিই করেছি, ভাই। তোর হাসির গান তো আমি শুনেছি। তোর গানের বারো আনা উপভোগের বিষয় হ'লো তোর মুখভঙ্গি। তোর মুখ যাতে সকলে বেশ দেখতে পায় সেইজন্যে অনেক খুঁজে খুঁজে ইলেকট্রিক মিস্তিরিদের কাছ থেকে ঐ ঘড়াঞ্চিটি যোগাড় ক'রে এনে এই ব্যবস্থা করেছি। একটু বেশী উঁচু মনে হচ্ছে? আর একটু ছোট ঘড়াঞ্চি যে পেলাম না। তা একটু উঁচু হ'লোই বা। তোর মুখ দেখতে পাওয়া নিয়ে কথা। ওঠ্ ভাই, আর দেরি করিসনি।'

কী আর করি! কায়ক্লেশে ঘড়াঞ্চির শিরোদেশের নিকটবর্তী

হলাম। দেখলাম, ঘড়াঞ্চির উপরের অপ্রশস্ত স্থানটির অধিকাংশই জুড়ে ব'সে আছে হারমোনিয়মটি। আমি বসি কোথায়? বাকিটুকুতে আমার স্থান-সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব। নীচের দিকে চেয়ে বললাম, 'ও দাদা, বসবো কোথায়? বসবার জায়গা যে নেই।'

দাদা নীচে থেকে বললেন, 'আমি নিজে ব'সে দেখেছি ভাই, ও ঠিকই আছে। হারমোনিয়মটা তো থাকবে তোর কোলের ওপর। একজনের বসবার মতো যথেষ্ট জায়গা আছে। তুই হারমোনিয়মটা এক পাশে সরিয়ে আগে ব'সে পড়, তারপর সেটিকে কোলের ওপর তুলে নে।'

দাদা তো ব'লে খালাস। বেশী সরাতে গেলে হারমোনিয়মের

ভূতলে পতন অবশ্যম্ভাবী। অথচ না সরালে আমার বসবার জায়গা হয় না। সার্কাসের খেলা দেখানোর মতো অনেক চেষ্টা-চরিত্র ক'রে উপরে উঠে ব'সে হারমোনিয়মটিকে কোলে তুলে নিলাম। একটুখানি হাঁফ ছেড়ে নীচের দিকে চেয়ে দেখি, দাদা নাই। কখন যে তিনি স'রে পড়েছেন, জানতেও পারিনি।

আমার অবস্থাটি অনুধাবনীয়। প্রকাণ্ড প্যাণ্ডেল, সম্মুখে তিন-চারশো শূন্য চেয়ার—জনমানবের নামগন্ধ নেই—আর সেই মহা-শ্মশানের এক প্রান্তে সাত হাত উঁচু ঘড়াঞ্চির ওপর হারমোনিয়মটি অঙ্কে স্থাপন ক'রে, রোহিতাশ্বকে কোলে নিয়ে শৈব্যার মতো ব'সে আছি আমি! নেমে পড়বো যে তারও উপায় নেই। যে রকম কায়দা ক'রে উঠেছি, নামবার সময় সেরূপ কসরত চলবে না। একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়লাম। এমন সময় পুনরায় দাদার আবির্ভাব। দাদা আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'পাঁচটা বেজে পনরো মিনিট হ'য়ে গেছে, একটা গান ধর ভাই!'

আমি ঘড়াঞ্চির ওপর থেকে বললাম, 'সে কি দাদা, গান শোনাবো কাকে? শ্রোতারা আসুক।'

দাদা বিপন্নের মতো কাঁদো কাঁদো সুরে বললেন, 'ছ্যাখ দিকি, কী বিপদেই পড়লাম! ওরা বলছে, গান আরম্ভ হোক তবে যাব; এদিকে তুই বলছিস, ওরা আসুক গাইবো।

আমি বিরক্ত হ'য়ে বললাম, 'দাদা, আমি নেমে পড়ছি। গাইবো না আমি, এক্ষুনি চ'লে যাব কলকাতায়।'

দাদা দারুণ প্রমাদ গণে বললেন, 'লক্ষ্মী ভাই আমার, রাগ করিসনি। দেখি যদি দু'চারজনকে আনতে পারি।'

কিছুক্ষণ পরে দাদা জন দশেক লোক কুড়িয়ে এনে সামনের

সারিতে বসিয়ে দিলেন। গান আরম্ভ করলাম। ক্রমে ক্রমে দু'চারজন ক'রে লোকও আসতে লাগলো। চার-পাঁচটি গানের পর পূর্ণ হ'লো মণ্ডপটি।

হাসির গান গাইলাম। শ্রোতারাও হাসলো। কিন্তু সে-হাসি আমার গান শুনে, কি আমার দশা দেখে—সেটা বুঝতে পারলাম না।

৯৬

বড় বেশী দিনের কথা নয়,—মাত্র পনরো-ষোলো বৎসর। স্বনামধন্য অভিনেতা শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বিদায়-অভিনন্দন সভা। উপলক্ষটা সম্পূর্ণরূপে স্মরণ নেই। বোধ হয়, বোম্বাই শহরে তাঁকে বিশেষ সম্মানজনক সর্তে কোনো ফিল্ম কোম্পানী আহ্বান করেছিলেন। বাঙালী অভিনেতার প্রতি বোম্বাইওয়ালারা সম্মান-প্রদর্শন করেছেন ব'লে তাঁকে সম্মানিত করবার জন্যে বাঙালীদেরও এই বিদায়-অভিনন্দনের আয়োজন। পুরাতন যুগের অ্যালফ্রেড রঙ্গমঞ্চে (যেখানে এখন 'দীপক' সিনেমা) তখন 'নাট্যভারতী' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই নাট্যভারতীতেই বিদায়-অভিনন্দন সভার অধিবেশন। আর পাঁচজন নিমন্ত্রিতের মতো আমিও নিমন্ত্রিত হ'য়ে সেই সভায় যোগদান করেছি। গান করবার কোনো কথা নেই। পোশাকে-পরিচ্ছদে অসামঞ্জস্য থাকলেও আদবকায়দা ঠিক রেখে বিশেষ ব্যক্তিদের সঙ্গে ব'সে আছি রঙ্গমঞ্চের ওপর। কিন্তু নিছক ভদ্রলোক হ'য়ে থাকবার ভাগ্য ভগবান আমাকে দেননি। অনুষ্ঠানের পরিচালকেরা ধ'রে বসলেন, একটি হাসির গান গাইতে হবে। তাঁদের বললাম, 'আগে বলতে হয়, তাহ'লে একটু প্রস্তুত হ'য়ে আসতাম।'

'এর আর প্রস্তুত হওয়া কি, আপনার ভাণ্ডারে তো অনেক গান আছে,—যা হয় একটা গেয়ে দেবেন।'

আমি বললাম, 'আচ্ছা দেখা যাবে, সভা আরম্ভ হোক তো।'

সভা আরম্ভ হবার অব্যবহিত পূর্বে ছাপানো অভিনন্দন-পত্র সকলকে বিতরণ করা হ'লো। রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত গানের একটি লাইন দিয়ে তার শিরোনামা—'জয়-যাত্রায় যাও গো'। ঐ লাইনটি দেখে নিজেকেই যেন ব'লে ফেললাম, 'আহা, যদি একটু আগে জানতে পারতাম, তাহ'লে রবীন্দ্রনাথের ঐ গানটির একটি প্যারডি লিখে ফেলা যেত।'

পার্শ্ববর্তী চেয়ারে বসেছিলেন অগ্রজ-প্রতিম সাহিত্যিক ও পুলিশ কোর্টের খ্যাতনামা উকিল শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়। তিনি আমার স্বগতোক্তি শুনতে পেয়ে উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'দেখ না একটু চেষ্টা ক'রে ; প্যারডি লিখতে আর কত সময় লাগবে ?'

সভা আরম্ভ হ'লো। বক্তার পর বক্তা উঠে অহীন্দ্রবাবুর গুণগান করতে লাগলেন। আমিও ঐ সভাক্ষেত্রেই গানটি রচনা করতে বসলাম। আমার এই রচনাকার্যে বক্তারা যদি সাহায্য না করতেন, তাহ'লে বোধ হয় গানটি পূর্ণাঙ্গ হ'তো না। এক একজন বক্তা এতই সময় নিলেন যে, মাত্র দুটি বক্তার ঘন্টাখানেক বক্তৃতার মধ্যে আমার গানটি লেখা শেষ হ'য়ে গেল। তার পরেও আমি প্রচুর সময় পেলাম গানটির সংস্কারের জন্যে।

যখন আমার গাইবার সময় এল, তখন অহীন্দ্রবাবুর দিকে চেয়ে গানটি গাইলাম—

জয়-যাত্রায় যাও গো,
ওঠো ওঠো জয়-রথে তব।

মোরা ফিলিম্, বেতার, থিয়েটার
আসা-পথ চেয়ে রব।
মোরা কণ্ট্রাক্ট ছেপে রাখি,
হাপিত্যেশ হ'য়ে থাকি,
ফিরে এলে, হে বিজয়ী,
নতুন বাঁধনে বাঁধিয়া লব।
ওঠো ওঠো জয়-রথে তব॥

আনিয়ো টাকার তোড়া,
টাকাগুলি বাজে যেন,
মেকিগুলো সব পালটিয়ে নিয়ো
যেন-তেন প্রকারেণ।
টাকা নিয়োনাকো চেকে,
শিখেছো তো বহু ঠেকে,
ঘুরেছো অনেক ঘাটে
কী আর তোমারে কব?

পাঁচজনে দশ কথা শোনালেও অহীন্দ্রবাবু কিন্তু গানটি শুনে খুশীই হয়েছিলেন। গানের সব কথাগুলোই তাঁর অন্তরের কথা।

সেকালে ইংরেজ সরকারের আর যত দোষই থাক, উপাধি-বিতরণের বেলায় কোনোরূপ কার্পণ্য-দোষ ছিল না। এই উপাধি বস্তুটি সাহিত্যিকদের বরাতেও জুটতো। অবশ্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের জন্য যেমন মহামহোপাধ্যায় উপাধিটিই নির্দিষ্ট ছিল, সাহিত্যিকদের

জন্যে সেরকম কোনো বিশেষ বরাদ্দ ছিল না। দু'টি উপাধি তাঁরা কাঙালী-ভোজনের মতো সর্বসাধারণকে দান করতেন, সেই রায়বাহাদুর বা রায়সাহেব উপাধি জুটতো সাহিত্যিকদের ভাগ্যে। রায়বাহাদুর উপাধি দীনেশচন্দ্র সেন, জলধর সেন প্রভৃতি কতকগুলো বাছা বাছা সাহিত্যিকদের কপালে জুটেছে, এ ছাড়া রায়সাহেব হয়েছেন নগেন্দ্রনাথ বসু, হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রভৃতি। একমাত্র ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথ। ইংরেজ সরকার তাঁকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগে ইংরেজের পাশবিক আচরণ দেখে কবি এই উপাধি প্রত্যাখ্যান ক'রে তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

সেদিনের কথাটি বলি, আমাদের জলধর-দা'কে গুণগ্রাহী সদাশয় ইংরেজ সরকার রায়বাহাদুর উপাধি দিয়ে যখন বিশেষ একটা গোষ্ঠীর চিহ্নিত ক'রে দিলেন। দাদার ভাগ্যে এই শিকে-ছেঁড়া উপলক্ষে শালকিয়ার 'গোবর্ধন নাট্য ও সাহিত্য সমাজ'-এ তাঁর সম্বর্ধনার আয়োজন হ'লো। জলধর সেন মহাশয় বাংলাদেশের সব সাহিত্যিকেরই জলধর-দা। কলকাতার বহু সাহিত্যিকই ছুটলেন তাঁকে অভিনন্দন দিতে। সরকারী উপাধি পাওয়া উপলক্ষে এ-রকম সম্বর্ধনা-সভা বোধ হয় আর কখনও হয়নি।

জলধর-দা গরদের ধুতি, গরদের পাঞ্জাবী, গরদের চাদর প'রে বুড়ো বরটির মতো বাসর আলো ক'রে ব'সে আছেন। সভা আরম্ভ হ'লো। আমাদের সাহিত্যিক বন্ধুরা বক্তৃতা করবার জন্যে একেবারে মুখিয়ে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান বক্তার স্থান গ্রহণ করলেন কবি নরেন্দ্র দেব। তিনি কবিজনসুলভ ভাষায় রসিয়ে রসিয়ে সরকারী খেতাবের স্বরূপ বর্ণনা করলেন। তাঁর ভাষণের বহু স্থান দোনলা

বন্দুকের মতো দ্ব্যর্থভাব ব্যক্ত ক'রে সভাক্ষেত্রে এক অপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি ক'রলো।

আমার নিজের কথাটাই বলতে ভুলে গেছি। একটি সময়োচিত গান গেয়ে আমি সভার উদ্বোধন করেছিলাম। খুব সম্ভব, আমার গাওয়া গানটি থেকে বক্তারা কিছু প্রেরণা পেয়ে থাকবেন। গানটি দ্বিজেন্দ্রলালের :

'আজি এ শুভদিনে শুভক্ষণে
উড়ায়ে দিই জয়ধ্বজায়।
উপাধি পেয়েছি যা
রাখতে তা ত হবে বজায়।
আমাদের ভক্তি যা এ,
এ যে গো মানের দায়ে,
এখন ত উচিত কার্য
এদিক ওদিক বুঝে চলাই।
সাধে কি বাবা বলি,
গুঁতোর চোটে বাবা বলায়॥' ইত্যাদি

কিবা আমার গান, কিবা নরেন্দ্রাদি বক্তাদের বাক্যবাণ,—সবই বৃথা। কোনো কিছুই জলধর-দা'কে কিছুমাত্র বিদ্ধ করতে পারলো না। বক্তারা যা বললেন, তিনি তার কিছুমাত্র উল্লেখ না ক'রে দরদে-ভরা চমৎকার একটি বক্তৃতা করলেন। যাঁরা সভাক্ষেত্রে এসেছেন, যাঁরা বক্তৃতা করলেন, সকলকেই তিনি যেন স্নেহভরে কোলে তুলে নিলেন। এত ব্যঙ্গবিদ্রূপ, এত শ্লেষ, এত বিরূপতা সত্ত্বেও জলধর-দা নিরুদ্বেগ, নির্বিচল, নির্বিকার। তার কারণ বোধ হয় এই যে, বক্তৃতা বা গানের একটি বর্ণও তাঁর কানে প্রবেশ করেনি, জলধর-দা কানে-খাটো ছিলেন।

পেশাদার গাইয়ে হ'লেও আমরা যে বিনা পয়সায় কোথায়ও গাইতাম না, এমন নয়। সারা মাসে ক'টাই বা পেশাদারী মুজরো আসে? অথচ প্রায় প্রত্যহই গাইতে হয় এখানে-ওখানে। দেশের নেতারা জেল থেকে খালাস পেয়ে এসেছেন, তাঁদের সম্বর্ধনা-সভায় গাইবার জন্যে কি ক'রে টাকা চাই বলুন? সেটা তো দেশদ্রোহিতারই সামিল। বানের জলে দেশ ভেসে গেল, যাঁরা এই সঙ্কট-ত্রাণের জন্যে দাতব্য ভাণ্ডার খুললেন, তাঁদের কাছ থেকেই বা টাকা চাই কি ক'রে? নিজের সঙ্কট-ত্রাণের কথা চিন্তা করাও তখন স্বার্থপরতা। প্রফুল্ল ঘোষ হেদোর জলে প'ড়ে সারা দুনিয়ায় রেকর্ড স্থাপন করবেন,—রাত্তিরটা তাঁকে জাগিয়ে রাখবার জন্যে তাঁর কানের কাছে ঢাক না-বাজিয়ে কর্তৃপক্ষ যে আমার গানের ব্যবস্থা করলেন, তার জন্যে তাঁরা কেন টাকা দেবেন বলুন তো? সে টাকাও তো জলে পড়ার সামিল! প্রফুল্ল ঘোষ জলে পড়েছেন কিন্তু সর্বক্ষণ ভেসে আছেন; টাকাটা জলে পড়লে, তৎক্ষণাৎ ডুববে আর উঠবে না! তা যাই হোক, আমরা বেশ হেসে খেলে গেয়ে অন্যের উনুনে রসের ভিয়েন চড়িয়ে আসতাম, নিজের উনুনে হাঁড়ি চড়ুক আর না-চড়ুক।

কলকাতার কোনো কলেজের একজন অধ্যাপক বন্ধু একদিন এসে ধরলেন তাঁদের কলেজের একটি অনুষ্ঠানে বিনা টাকাতে গাইতে হবে। বন্ধুর অনুরোধ, 'না' বলতে পারলাম না। ঠিক দিনটিতে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি, আরও দু'তিনজন পেশাদার গাইয়ে এসেছেন। সন্ধ্যা থেকে প্রায় তিন ঘণ্টা আসর চললো।

সেই কলেজের হোস্টেল-সুপারিন্টেণ্ডেন্টটি আমার সুপরিচিত এবং আমার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ভগিনীপতি। গানের আসর ভেঙে যাবার পর তিনি তাঁর হোস্টেল-সংলগ্ন বাসায় আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে আমাকে বললেন, 'অমুক অধ্যাপকটি কি রকম বন্ধু আপনার ? কতদিনের আলাপ ?'

আমি বললাম, 'আলাপ খুব বেশী দিনের নয়। কেন বলুন তো ?'

ভদ্রলোক উত্তেজিত হ'য়ে বললেন, 'আরে মশায়, আজকের এই অনুষ্ঠানটির খরচপত্রের জন্যে হপ্তাখানেক আগে আমাদের একটা মীটিং হয়েছিল। তাতে আপনি সমেত চার-পাঁচজন গায়ককে আনাবার কথা স্থির হ'লো। এটাও স্থির হ'লো যে, গায়কদের প্রত্যেককে পঁচিশ টাকা ক'রে দেওয়া হবে। হঠাৎ সেই অধ্যাপকটি দাঁড়িয়ে উঠে সেই সভায় আপনার নাম ক'রে বললেন, 'ওঁকে টাকা দিতে হবে না, উনি আমার বিশেষ বন্ধু। ওঁকে বিনা টাকাতেই আমি নিয়ে আসবো। বুঝুন ব্যাপারটা।'

আমি তো চমকে উঠলাম, 'বলেন কি ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই। আজকের আসরে যাঁরা গাইলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই পঁচিশ টাকা ক'রে পেয়েছেন, কেবল আপনিই পেলেন না অথচ আমরা দিতে প্রস্তুত ছিলাম।'

আমি বললাম, 'কি করি বলুন, বন্ধুর অনুরোধ।'

'বন্ধুই বটে !'

এককালে আমি দীর্ঘদিন শ্যামবাজার অঞ্চলে ছিলাম। সেই সময় পাড়ার ছেলেদের নিয়ে 'কে বি' ক্লাব নামে একটি ক্লাবের প্রতিষ্ঠা

করেছিলাম। অমল হোম, সজনীকান্ত দাস প্রভৃতি বিশিষ্ট বন্ধুরা 'কে বি' ক্লাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ক্লাবের ছেলেরা প্রতিবৎসর দোলের দিন সারারাত্রিব্যাপী উৎসব ক'রতো। এই উৎসবে গাইয়ে-বাজিয়েরাও নিঃস্বার্থভাবে এসে আনন্দ ক'রে যেতেন। একবার ক্লাবের কর্মী ছেলেরা আমাকে ধ'রলো, সেবারের দোলের উৎসবে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীকে ঠিক ক'রে দিতে হবে। আমি নিজে জ্ঞানবাবুর কাছে না-গিয়ে একখানা চিঠি লিখে দিলাম এই মর্মে যে, 'এরা টাকাকড়ি দিতে পারবে না। সেদিন যদি অন্য কোথায়ও আপনার অর্থপ্রাপ্তিযোগ না থাকে, তাহ'লে আমাদের ক্লাবে এসে একটু আনন্দ দিলে বিশেষ বাধিত হব।' আমার তরুণ বন্ধুরা ফিরে এসে বললে, 'জ্ঞানবাবু রাজী হয়েছেন। আসবেন দোলের দিন।'

দোলযাত্রার দিনটি এল। রাস্তার ছেলেরা বেপরোয়া। ছোট-বড়ো, নারী-পুরুষ বাছবিচার নেই, রঙ দেবেই। পিচকিরি উঁচিয়ে দল বেঁধে রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে কি শুধু রঙ দেওয়া ?—রঙে চুবিয়ে দেওয়া ! এই রঙের ভয়ে আমি সেদিন সকালবেলায় বাড়ী থেকে বেরোইনি। নিজেরই ঘরে চোরের মতো লুকিয়ে ব'সে আছি। হঠাৎ নীচে থেকে সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হ'লো, 'নলিন-দা !'

আমার 'কে বি' ক্লাবের সোনারচাঁদ ভায়েরা—জগু, শম্ভু, বিষ্ণু, বিদ্যুৎ, সারদা—সব দল বেঁধে এসেছে রঙ খেলতে। ডাকের পর ডাক। উপর থেকে কোনো সাড়া মিললো না দেখে তারা অন্যত্র হামলা দিতে বেরিয়ে পড়লো। ধড়ে প্রাণ এল আমার। অবশ্য বেশিক্ষণের জন্যে নয়। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে 'আবার আবার ঐ কামান গর্জন':—'নলিন-দা !'

এবারে আর তারা নয়,—বুড়ো শালিকদের শখ হয়েছে হোলি

খেলতে। এসেছেন সাহিত্যিকের দল। সটান উপরে উঠে এসে বন্ধ দরজার কপাটে ধাক্কার পর ধাক্কা আর ডাকাতের দলের মতো 'দে রণ, দে রণ' চিৎকার। কোনো উপায় না পেয়ে আমি আপাদমস্তক

কম্বল-মুড়ি দিয়ে, দরজা খুলে থরথর ক'রে সারা দেহ কাঁপাতে কাঁপাতে গিয়ে অবনতমস্তক হ'য়ে আর্তস্বরে তাঁদের নিবেদন করলাম, 'বাবু বাড়ী নেই।'

সাহিত্যিক বন্ধুরা সেই প্রকাশ্য দিবালোকে আমার উক্তিকে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত চাকরের উক্তি ভেবে, হতাশ মনে সিঁড়ি বেয়ে নীচে চ'লে গেলেন! সেই লোমহর্ষক পরিস্থিতির মধ্যে সকাল থেকে দুপুর

পর্যন্ত কোনো রকমে অতিবাহিত ক'রে বিকেলবেলায় গেলাম 'কে বি' ক্লাবে। এ-বেলা আর রঙের অত্যাচার নেই, আছে কেবলমাত্র ফাগের খেলা। সেখানে যাওয়া মাত্র আমার তরুণ বন্ধুরা ফাগের কথা ভুলে গিয়ে নিতান্ত বিমর্ষ হ'য়ে বললে, 'জ্ঞানবাবুর রক্তামাশয়, তিনি আসতে পারবেন না। এখন উপায় কি নলিন-দা ?'

সত্যিই চিন্তার কথা। তাদের বললাম, 'তাই তো, হঠাৎ এখন গাইয়েই বা কোথায় পাই, বিশেষ আজকের দিনে। আচ্ছা, কিছু টাকা তোমরা চাঁদা ক'রে তুলতে পারো ?'

'কত ?'

'পঁচিশ।'

তারা মহা উৎসাহের সঙ্গে বললে, 'দেবো পঁচিশ টাকা, কিন্তু ভালো গাইয়ে আনতে হবে। জ্ঞানবাবুর অভাব যাতে পূরণ হয়।'

আর দেরি না ক'রে আমি বেরিয়ে পড়লাম গাইয়ে খুঁজতে। প্রথমে গেলাম জ্ঞানবাবুরই বাড়ী। বাড়ীর দরজার কড়া নেড়ে চিৎকার ক'রে তাঁর নাম ধ'রে ডাকতে লাগলাম। দোতলার উপরে জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে জ্ঞানবাবু উত্তর দিলেন, 'সকাল থেকে দারুণ রক্তামাশয়ে ভুগছি নলিনীবাবু...... ।'

তাঁর কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'অসুখের কথা শুনেই আমি রক্তামাশয়ের ওষুধ নিয়ে এসেছি। আপনি একটিবার নীচে নেমে আসুন।'

কাতরাতে কাতরাতে সিঁড়ি ভেঙে জ্ঞানবাবু নীচে নেমে এলেন। আমার কাছে আসতেই তাঁকে বললাম, 'পঁচিশ টাকা দেবে তারা। চলুন না।'

জ্ঞানবাবু হেসে ফেললেন। বললেন, 'দেখুন তো, শেষকালে

কী কাণ্ড ক'রে বসলেন আপনি! সকালবেলায় ওদের যে বলেছি, রক্তামাশয় হয়েছে।'

'বলেছেন তো হ'য়েছে কি? সকালকার রোগ কি সন্ধ্যায় সারে না? চলুন মশায়, সবাই মিলে একটু আনন্দ করা যাক আজ।'

জ্ঞানবাবু বললেন, 'তা আপনি যখন বলছেন, তখন কি আর না গিয়ে পারি? কিন্তু আপনি যেন কিছু মনে করবেন না।'

আমি বললাম, 'আমি আবার কি মনে ক'রবো মশায়, এ-রকম রক্তামাশয়ে যে আমাকেও মাঝে মাঝে ভুগতে হয়।'

নিজে পেশাদার গাইয়ে ছিলাম ব'লে পেশাদার গাইয়েদের মনস্তত্ত্বটা আমি সহজেই বুঝতে পারতাম। একবার 'আওয়ার অর্কেস্ট্রা'র শ্রীমান সারদা গুপ্ত এসে ধ'রে বসলো, তাদের 'সুরেন্দ্রলাল স্মৃতি বার্ষিকী'তে শচীন দেববর্মনের গানের ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে। সারদাকে সঙ্গে নিয়ে বেরোলাম শচীন দেববর্মনের খোঁজে। অনেক চেষ্টার পর হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীতে তাঁকে ধরলাম। যাত্রার দলের লক্ষ্মণের প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের মতো কণ্ঠে স্নেহভরা সুর এনে শচীনকে বললাম, 'ভাই শচীন, একটা অনুরোধ আছে যে!'

'কি বলো নলিনী-দা!'

সারদার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে বললাম, 'ইনি 'আওয়ার অর্কেস্ট্রা'র কর্মসচিব। সুরেন্দ্রলাল দাসের স্মৃতিসভা করছেন এঁরা। তোমাকে যেতে হবে যে, ভাই।'

'কবে?'

'দোসরা জানুয়ারী—ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে।'

শচীন বললে, 'ও নলিনী-দা, আমি যে পয়লা জানুয়ারী কলকাতার বাইরে চ'লে যাচ্ছি। তা নৈলে নিশ্চয়ই যেতাম।'

আমি হতাশাব্যঞ্জক স্বরে বললাম, 'তা হ'লে আর কী ক'রবো ভাই, দোসরা জানুয়ারী যখন থাকছোই না, তখন আর কথা কী? যাক, নিমন্ত্রণপত্রখানি তো নাও।'

শচীন খামখানি হাতে নিয়ে ভিতরের ছাপানো চিঠিখানি টেনে বের ক'রে মনে মনে পড়তে লাগলো। একটুখানি পড়েই চমকে উঠে আমার দিকে চেয়ে বললে, 'একি, সাতাশে ডিসেম্বর যে! তুমি দোসরা জানুয়ারী বললে না?'

আমি বললাম, 'হাঁ ভাই, দোসরা জানুয়ারীই বলেছিলাম। সাতাশে ডিসেম্বর বললে যদি বলতে ছাব্বিশে কলকাতার বাইরে চ'লে যাবে, তাই আসল তারিখটে গোড়ায় বলিনি।'

শচীন অপ্রস্তুত হ'য়ে বললে, 'আচ্ছা লোক তো তুমি!'

একবার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে বললেন, 'প্রতি বৎসরই আমাদের এই অনুষ্ঠানটিতে কেবল বক্তৃতার পর বক্তৃতাই হয়, এবারে গান-বাজনার ব্যবস্থা করতে পারেন?'

আমি তখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট এবং রেডিয়ো অফিসে চাকরি করি। কলকাতা বেতার-প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র 'বেতার-জগত'-এ কাজ করার জন্যে রেডিয়োর গায়ক-গায়িকাদের সঙ্গে বেশ একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও হ'য়েছিল। বেতার জগতে তাঁদের প্রচার-কার্য সুষ্ঠুরূপে হবে ব'লে তাঁরা আমার ওপর কিঞ্চিৎ ভরসাও রাখতেন।

তাই, আমিও তাঁদের ওপর ভরসা ক'রেই ব্রজেন-দা'র প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে, সাহিত্য-পরিষদে সঙ্গীতানুষ্ঠানের ভার স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে নিজের স্কন্ধে তুলে নিলাম।

রেডিয়ো অফিসে যাঁদের বললাম, সকলেই রাজী হ'লেন। সকলেই গায়ক ও বাদক। অন্ততঃ একটি বামা-কণ্ঠ না হ'লে আসর জমে না, একথা ভাবছি। এমন সময় একটি সুকণ্ঠী মহিলার সঙ্গে দেখা। তাঁকে অনুরোধ করামাত্র একগাল হাসি হেসে তিনিও পরমানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। তারিখটা জিজ্ঞাসা ক'রে যখন জানলেন সেটি রবিবার, তখন তিনি বললেন, 'রবিবারে আমি অমুক ইস্কুলে মেয়েদের গান শেখাই, সেখানে গাড়ী পাঠিয়ে আমাকে নিয়ে যাবেন।'

মনে মনে ভারী খুশী হলাম। এতক্ষণে অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হ'লো।

এই অনুষ্ঠানের দিনটিতে আমি অধিবেশনের ছু'ঘণ্টা পূর্বেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে গেছি। আসরের ব্যবস্থা আমাকে করতে হবে, আর্টিস্টরা আমারই পরিচিত, সুতরাং তাঁদের অভ্যর্থনাও করতে হবে আমাকে,—এই সব কারণে আমি একটু আগেই গেছি সেখানে। ব্রজেন-দা'কে বললাম, 'একটি মহিলা আর্টিস্টকে দক্ষিণ কলকাতা থেকে আনবার জন্যে একখানা গাড়ীর দরকার। আর, একজন বয়স্ক ব্যক্তি যদি সঙ্গে যান, তাহ'লে বড় ভালো হয়। অন্যান্য আর্টিস্টদের জন্যে আমাকে এখানে থাকতেই হবে, নইলে আমিই যেতাম।'

ব্রজেন-দা চিন্তিত হ'য়ে বললেন, 'গাড়ী না-হয় একখানা দিচ্ছি, কিন্তু সঙ্গে যাবে কে?'

শেষ পর্যন্ত সজনীকান্ত দাস রাজী হ'য়ে সেই মহিলাটিকে আনবার জন্যে গাড়ী নিয়ে দক্ষিণ কলিকাতা অভিমুখে রওনা হলেন। বড়

বেশিক্ষণ নয়, ঘণ্টা-খানেক পরে ফিরে এলেন সজনীকান্ত। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'একা যে, আর্টিস্ট কই ?'

সজনীকান্ত বললেন, 'তিনি খোস মেজাজে, সুস্থ শরীরে, বহাল তবিয়তে তাঁর গানের ইস্কুলে মাস্টারী করছেন।'

'না না, কি হ'লো ? এলেন না ?'

সজনীকান্ত বললেন, 'আসবেন না কেন ?—দোতলা থেকে একতলা পর্যন্ত এলেন, তারপরে আর এলেন না।'

আমি বললাম, 'ব্যাপার কি, খুলেই বলুন না।'

সজনীকান্ত ব'লে চললেন, 'গেলাম তো আপনার দেওয়া ঠিকানায়। গাড়ীখানি রাস্তার ওপর রেখে ঢুকলাম সেই গানের ইস্কুলে। ইস্কুলের অফিস-ঘরে একটি ভদ্রলোক—বোধ হয় ইস্কুলের কেরানী—ব'সে ছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম মহিলাটি দোতলায় গানের ক্লাসে গান শেখাচ্ছেন। ভদ্রলোকটিকে বললাম, অনুগ্রহ ক'রে মহিলাটির কাছে একটু খবর পাঠিয়ে দিন যে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে গাড়ী এসেছে। একটি লোক গেল খবর নিয়ে। আমি আর সেই ভদ্রলোক দু'জনে দু'খানি চেয়ারে অফিস-ঘরে ব'সে রইলাম। মহিলাটি ওপর থেকে নেমে ঘরের মধ্যে ঢুকে সেই ভদ্রলোকের চেয়ারের একটি হাতল ধ'রে অজন্তা স্টাইলে দাঁড়িয়ে চুপি চুপি তাঁকে বললেন, 'দেখুন, সাহিত্য পরিষদ থেকে যে গাড়ীখানা এসেছে না, ঐ গাড়ীর ড্রাইভারটিকে ব'লে দিন যে—তাঁর জ্বর হয়েছে, যেতে পারবেন না।' ভদ্রলোকটি আমার দিকে চাইতেই আমি মহিলাটিকে বললাম, 'আজ্ঞে, আমিই আপনাকে নিতে এসেছিলাম সাহিত্য পরিষদ থেকে।' তা আপনার যখন জ্বর হয়েছে তখন আর যাবেন কি ক'রে ?—' ব'লে আমি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালাম। ঘর থেকে বেরোবার সময়ও দেখি, মহিলাটি ফিল্ম-স্টারের মতো আমার দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে আছেন।'

হাসির গান গেয়ে সুনাম কতটা পেয়েছি ভগবানই জানেন, কিন্তু দুর্নাম কুড়োতে আদৌ বেগ পেতে হয়নি। নিতান্ত ছারকপালে না হ'লে এমনটা হয় না।

সেকালে গোয়াবাগানে আমার একজন বন্ধু ছিলেন, নাম রবি বাঁড়ুজ্জে। মাঝে মাঝে রবির বাড়ীতে যেতাম আড্ডা দিতে। সন্ধ্যার

সময় সেখানে গেলে আর রক্ষা থাকতো না। ছেলেমেয়েরা ধ'রে বসতো—গাইতেই হবে। গুটিকতক শ্রোতা নিয়ে দস্তুরমতো গানের আসর ব'সে যেত। বলা বাহুল্য, হাসির গানের প্রতিই তাদের ঝোঁক ছিল বেশী। আমি যে-সব হাসির গান সেখানে গাইতাম, সেগুলির মধ্যে একটি বিশেষ গান তাদের খুব প্রিয় ছিল। সেটি হচ্ছে, ডি. এল. রায়ের 'পাঁচটি এয়ার'। নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুদের আসর ছাড়া এ-গানটি আমি অন্য কোথাও বড়-একটা গাইতাম না। কারণ, গানটি গাইতাম অভিনয়ের ঢঙে। মাথার চুল উস্কোখুস্কো ক'রে,

বগলে বোতল নিয়ে, টলতে টলতে জড়িত কণ্ঠে গাইতাম-

'আমরা পাঁচটি এয়ার, দাদা,
আমরা পাঁচটি এয়ার।'

এই বাড়ীর পাশেই থাকতেন প্রসিদ্ধ অ্যাটর্নি কুঞ্জবিহারী ঘোষ। সে-সময় তাঁর সঙ্গে আমার কোনরূপ আলাপ-পরিচয় ছিল না। পনরো-ষোলো বছর পরে তাঁর ডাফ্ স্ট্রীটের বাড়ীতে যখন শ্রীঅরবিন্দ পাঠচক্র ও ধ্যানকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, সেই প্রতিষ্ঠা-দিবসে খবর পেয়ে আমিও তাঁর বাড়ীতে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি অনেকগুলি শ্রীঅরবিন্দ-ভক্তের সমাবেশ হয়েছে। কুঞ্জবাবু সকলের সঙ্গেই আলাপ-আপ্যায়ন করছেন, কিন্তু আমার উপর তাঁর আদৌ আগ্রহ নেই। বরং তাঁদের আলাপ-আলোচনায় গায়ে প'ড়ে দুটো-একটা কথা কইলে আমার প্রতি উপেক্ষার ভাবই তিনি প্রদর্শন করছেন। আমি যেন তাঁর অবাঞ্ছিত অতিথি।

কিন্তু এ-ভাব আর বেশী দিন রইলো না। প্রতি রবিবারে তাঁর বাড়ীতে পাঠচক্রে যেতে যে'তে এমন ঘনিষ্ঠতা হ'লো যে, প্রত্যহ অন্ততঃ একটিবার তাঁর সঙ্গে দেখা না হ'লে চলতো না। এই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব-স্থাপনের পর একদিন কথায় কথায় কুঞ্জবাবু বললেন, 'আরে মশায়, গোয়াবাগানে আমাদের বাড়ীর পাশের বাড়ীতে আপনি যেতেন, আহা তখন যদি আপনার সঙ্গে আলাপ হ'তো!'

আমি বললাম, 'আলাপ করলেই পারতেন।'

কুঞ্জবাবু ঈষৎ হেসে বললেন, 'আলাপ কেন করিনি জানেন? আপনাকে আমি জানতাম একটি পাঁড় মাতাল ব'লে। পাশের বাড়ীতে মদের বোতল নিয়ে আপনাকে মাতলামি করতে দেখেছিলামও। পরে অবশ্য শুনেছিলাম যে, আপনি মাতালের ক্যারিকেচর করছিলেন। কিন্তু তাতেও আপনার সম্বন্ধে আমার ধারণা পাল্টায়নি। এখানে যেদিন পাঠচক্র প্রতিষ্ঠিত হ'লো, সেদিন আপনাকে দেখে আমার কেবলই মনে হয়েছিল, এ মাতালটা এখানে কেন এল?'

আমি বললাম, 'এখন কি মত পাল্‌টেছে ?'

কুঞ্জবাবু হেসেই বললেন, 'কতকটা।'

দুর্নাম তো দূরের কথা,—হরেক রকম কারণে গালাগালিও খেয়েছি হরেক রকম। গানের ভিতর দিয়ে রসিকতা করতে গিয়ে গালাগালি খাওয়ার কথা আগেই বলেছি, কিন্তু গান গেয়ে রসিকতা না ক'রেও গালাগালি খেয়েছি।

কলকাতা থেকে কুড়ি-পঁচিশ মাইল দূরে এমন একজন গুণী ব্যক্তি আছেন, যিনি ভৌতিক চিকিৎসা ক'রে অনেক দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি নিরাময় ক'রে থাকেন। এই খবরটি পেয়ে কবি-বন্ধু নজরুল ইস্‌লাম তাঁর স্ত্রীর পক্ষাঘাত রোগের চিকিৎসার জন্যে সেই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবার সঙ্কল্প করলেন। চিকিৎসককে খবর দিয়ে দিনক্ষণ স্থির ক'রে একদিন সন্ধ্যায় নজরুল রওনা হলেন তাঁর নিজের মোটরে। সঙ্গে গেলাম আমি আর বন্ধুবর হেমচন্দ্র সোম। যথাস্থানে পৌঁছলাম সন্ধ্যা আটটা সাড়ে-আটটায়।

ভৌতিক চিকিৎসার কথাটা একটু সংক্ষেপে ব'লে নিই। সেটা সেখানে গিয়ে ভালো ক'রে আমরা জানতে পারলাম। ভৌতিক চিকিৎসা মানে, স্বয়ং ভূত অশরীরে উপস্থিত হ'য়ে রোগের বিবরণ শ্রবণ করেন ; অশরীরী কণ্ঠে নাকী সুরে কথা ক'য়ে নিজের অভিমত জ্ঞাপন করেন এবং নিজের হাতে গাছের শিকড় তুলে এনে ওষুধ দিয়ে থাকেন। ওষুধের প্রয়োগ-বিধি, পথ্যাপথ্য সবই সর্বজনসমক্ষে খোনা-খোনা ভাষায় তিনি ব্যক্ত করেন। যে গুণী ব্যক্তিটির কথা বলেছি, তিনি হচ্ছেন ভূতের প্রতিনিধি মাত্র। ভূতটিকে আহ্বান ক'রে নিয়ে আসেন

আর রোগীর প্রতি প্রসন্ন হবার জন্যে ভূতের কৃপা প্রার্থনা করেন। ভূতের সে এক অদ্ভুত কাণ্ড! আমরা স্বচক্ষে দেখে নয়ন-মন সার্থক করেছি।

আমরা পৌঁছে দেখি, আরো কয়েকজন নারী-পুরুষ সেখানে সমবেত হয়েছেন। আমাদের পৌঁছনো খবর পেয়ে অন্তঃপুর থেকে সেই গুণী ব্যক্তির একজন চেলা আমাদের অভ্যর্থনা ক'রে বাড়ীর বাইরে বারান্দায় একখানি মাত্নর পেতে বসালেন। এবং সেই গুণী ব্যক্তির গুণ বর্ণনা আরম্ভ করলেন,—তিনি একজন মহাসাধক, মহাপুরুষ ইত্যাদি। সব শেষে আমাদের জানালেন, 'বাবা নিশিরাত্রে এসে থাকেন। আপনাদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।'

বাবা মানে ইহলোকের বাবা নন,—পরলোকের বাবা। অর্থাৎ সেই ভূত। আর নিশিরাত্রি হচ্ছে নিশীথ রাত্রি। চেলার কথা শুনে বুঝতে পারলাম, গুণীটি চক্রে ব'সে ধ্যানযোগে সেই অশরীরী আত্মার আবাহন করছেন। তাঁর আবির্ভাব হবে রাত বারোটায়। সুতরাং আমাদের তিন-চার ঘণ্টা অপেক্ষা করতেই হবে।

বাড়ীর বাইরে তু'দিকে তু'টি বারান্দা, মাঝে অন্তঃপুরে যাবার প্রবেশ-পথ। এক পাশের বারান্দায় আমরা তিন বন্ধুতে ব'সে রইলাম। অপরদিকের বারান্দায় কতকগুলি নারী—অন্ধকারে ভালো দেখাও যায় না—গলার স্বর শুনে মনে হয় সকলেই বৃদ্ধা বা প্রৌঢ়া। তুটি-একটি পুরুষ কণ্ঠস্বরও তাঁদের দিক থেকে শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল।

তিন-চার ঘণ্টা কি ক'রে কাটবে, এইটেই একটা সমস্যা হ'য়ে পড়লো। একটু তন্দ্রালু হবারও উপায় নেই। প্রহরারত মশককুল ঘন-ঘন কর্ণকুহরে ওয়ার্নিং দিয়ে সজাগ ক'রে দিয়ে যায়। সময়-কাটানোর জন্যে আমরা গান গাইতে আরম্ভ করলাম। এ আর হাসির

গান নয়। চেলাটির কাছে শুনলাম, সেই গুণী ব্যক্তিটি উঁচু দরের তান্ত্রিক সাধক। তাই আমরা এই সাধন-পীঠে সাধন-সঙ্গীতই গেয়ে চলেছি একের পর আর। নজরুল গাইছেন তাঁর স্বরচিত অপূর্ব শ্যামা-সঙ্গীতগুলি,—যার প্রভাবে অতি সহজেই ভক্তের মন ভগবতুন্মুখী হ'য়ে ওঠে। বিপন্ন নজরুল তাঁর স্ত্রীর রোগ-নিরাময়ের জন্য ভগবৎ-করুণার প্রত্যাশী হ'য়ে এসেছেন, সুতরাং তাঁর কণ্ঠে শরণাগতির ভাবটা গানের

কথায় কথায় ফুটে উঠছে। নজরুল ভক্তিগদগদকণ্ঠে দরদ দিয়ে গাইছেন ঃ

'আমি মা ব'লে যত ডেকেছি, সে-ডাক
নূপুর হয়েছে ও রাঙা পায়।

আমার শত জনমের কত নিবেদন
ঐ চরণ জড়ায়ে কহিয়া যায়॥'

এমন সময় বারান্দার অপর দিক থেকে বাজখাঁই আওয়াজে একটি বামাকণ্ঠে যেন কাংস্যধ্বনি উত্থিত হ'লো, 'হাঁ গা, তোমাদের ঘরে কি মা-বোন নাই! গান-বাজনা শোনানোর নোক কি নিজের ঘরে পেলে না? তোমরা কিরকম ভদ্দরনোক গা, যে রেতের বেলায় মেয়েদের দেখে গান ধ'রে দিয়েছ বাছা?'

আমরা তো হকচকিয়ে গেলাম। নজরুলের ভাবও ভেঙে গেল। অতঃপর আমরা নীরবে মশক-দংশনই বাঞ্ছনীয় মনে করলাম।

সেকালে অর্থাৎ কলকাতা বেতার-প্রতিষ্ঠানের আদিযুগে অনেক-গুলি সাময়িক পত্রে বেতারের আসরের সাপ্তাহিক সমালোচনা বের হ'তো। 'আজকাল' ব'লে একখানি সাপ্তাহিক ছিল। তার বেতার-সমালোচক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র আর আমাকে গালাগালি না-দিয়ে জলগ্রহণ করতেন না! কিন্তু 'দীপালী'র সমালোচক কেন যে একবার গালাগালি দিয়ে আমার গানের বিরুদ্ধ-সমালোচনা করেছিলেন, তার কারণ আজ পর্যন্ত খুঁজে বের করতে পারিনি।

ব্যাপারটা উপভোগ করবার মতো। রেডিয়োতে একদিন আমার হাসির গান। 'বেতার জগতে' আমার গানের তারিখ ও সময় ছাপা হয়েছে। আমার গানের নির্দিষ্ট সময়ের ঘণ্টাখানেক পূর্বে রেডিয়ো অফিসে আমি পৌঁছেছি। সেখানে ব'সে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্পগুজব করছি, এমন সময় আমার কাছে একটি টেলিফোন 'কল' এলো। টেলিফোনে খবর এলো, কবি নজরুলের পুত্র বুলবুলের মৃত্যু

হয়েছে, অবিলম্বে আমার সেখানে পৌঁছনো প্রয়োজন। খবরটি পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি ছুটলাম নজরুলের বাড়ী। সেদিন রেডিয়োতে আমার আর গান গাওয়া হ'লো না।

অথচ তারপরের সপ্তাহের 'দীপালী'তে আমার সেদিনের গানের সমালোচনা বেরিয়ে গেল! যে-দুটি গান আমার গাইবার কথা ছিল, দুটি গানেরই গোড়াকার লাইন ছাপা হয়েছিল 'বেতার জগতে'। সেই দুটি লাইন অবলম্বন ক'রে সমালোচক মহাশয় তীব্র ভাষায় আমাকে আক্রমণ করেছেন।—আমি গান দু'টিতে আদৌ রসসৃষ্টি করতে পারিনি, গান গাওয়াও হয়েছিল অশ্রাব্য—ইত্যাদি কটূক্তি ক'রে সমালোচক আমাকে ব্যাঙ-খোঁচানি খুঁচিয়েছেন।

আমি ভাবলাম, গান আদৌ গাইলাম না, তাইতেই এত; গাইলে না-জানি আমার কি দশা হ'তো!

ভবানীপুরে, বেলতলা রোডে একটি আসরে গাইতে গিয়ে একজন শ্রোতার কাছ থেকে এমন তারিফ পেলাম যে, সেটা সাধুবাদ কি নিন্দাবাদ বুঝে উঠতে পারলাম না।

বেশ জমজমাট আসর। অনেকগুলি ভদ্রলোক ও মহিলা সমবেত হয়েছেন। সকলের পুরোভাগে বসেছেন একজন বিশেষ ধরনের ব্যক্তি—সকলের থেকে স্বতন্ত্র। বাড়ীর কর্তাব্যক্তিরা সকলেই তাঁকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করছেন। আমার সম্মুখেই বসেছেন তিনি। ভদ্রলোকের বয়সটা ঠিক ধরা যায় না। মস্তকটি কেশবিরল। মস্তকের ইন্দ্রলুপ্তের অপবাদ অবলুপ্ত করেছে বদনমণ্ডলের আরণ্য-সুষমা। প্রশস্ত কবাট-বক্ষ আবৃত করেছে ঘন প্রলম্ব শ্মশ্রুরাজি।

আমার প্রতি গানে ইনি বাহবা দিয়ে চলেছেন নানা রকম উৎসাহ-ব্যঞ্জক ধ্বনির দ্বারা। শেষ গানটি গেয়ে শেষ করলাম যখন, তখন ভদ্রলোকটি আমাকে সম্বোধন ক'রে বললেন, 'বাবা, তোমাকে একটি কথা ব'লবো। মনে রেখো। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।'

আসর শেষ হ'লো ব'লে শ্রোতৃবৃন্দ চ'লে যাচ্ছিলেন, কিন্তু এই ভবিষ্যতে কাজে লাগার কথাটা শোনবার জন্যে সকলেই দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁদেরও তো ভবিষ্যৎ আছে।

আমি ভদ্রলোকটিকে বললাম, 'কি বলবেন, বলুন।'

ভদ্রলোক উপদেশ দেওয়ার ভঙ্গিতে বলতে লাগলেন, 'তোমাকে একটিমাত্র কথাই ব'লবো। কথাটা আর কিছুই নয়—চরিত্রটি যাতে পবিত্র থাকে তার চেষ্টা ক'রো।'

সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ আমার দিকে এমনভাবে চাইলেন যে, আমার চরিত্রের একটা গোপন কথা ঐ ভদ্রলোকটি যেন ফাঁস ক'রে দিয়েছেন। আমি ছাড়া আর সকলেরই মুখে-চোখে ঔৎসুক্য জেগেছে ভদ্রলোকের কাছ থেকে আমার আরও কিছু গোপন তথ্য জানবার জন্যে। আমার দিকে চেয়ে ভদ্রলোকটি আবার বলতে আরম্ভ করলেন, 'তোমাকে ঐ কথাটি বললাম বাবা, তোমারি ভালোর জন্যে। চরিত্রে সংযম না থাকলে কণ্ঠস্বর ঠিক থাকে না। ভগবান তোমাকে অমন জোরালো কণ্ঠস্বর দিয়েছেন, সেটির তেজ রক্ষা ক'রো। বিশেষ ক'রে একটি বয়স আছে,—কণ্ঠস্বরের পক্ষে মারাত্মক কাল। চল্লিশ বছর বয়সে অসংযমী লোকদের কণ্ঠস্বর স্বভাবতঃই বিকৃত হ'য়ে যায়। ঐ বয়সটাতে একটু বিশেষ সাবধানে থেকো বাবা!'

আমি তাঁর প্রতি বিনয়াবনত হ'য়ে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করলাম, 'আপনার বয়স কত?'

'আমার বয়স ?—সাতচল্লিশ।'

আমি মৃদু হেসে ভদ্রলোককে বললাম, 'ন'বছর আগে আমি

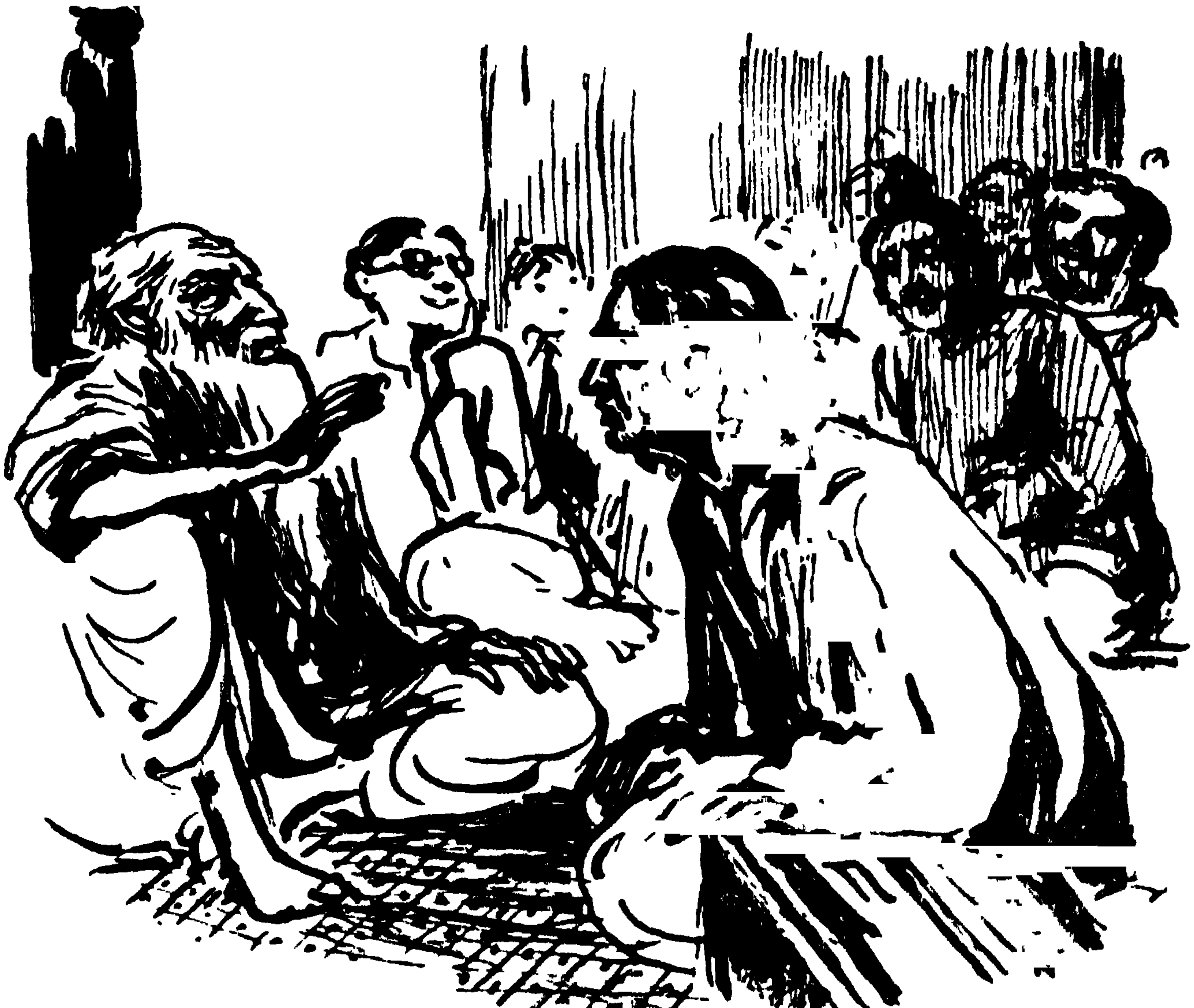

চল্লিশ পেরিয়ে এসেছি ; আর আপনার চেয়েও বোধ হয় বছর দুয়েকের বড়োই হবো।'

অপত্য-সম্বোধন ছেড়ে ভদ্রলোক অবাক হ'য়ে বললেন, 'বলেন কি !'

অনেকেই অর্থ উপার্জন করে, কেউ কেউ উপহার-বকশিশও পায়। পণ্ডিত জওহরলালের কাছ থেকে আমেরিকার লোকেরা হাতীও উপহার পেয়েছে। সেটা অবশ্য বড়ঘরের বড় কথা। কিন্তু কোনো গাইয়ের

গান শুনে কোনো গুণগ্রাহী শ্রোতা বাঘ বকশিশ দেবার প্রস্তাব করেছে কি ? বাঘ, বাঘ,—খেলনার বাঘ নয়—জঙ্গলের জ্যান্ত বাঘ।

কলকাতায় যে-সব সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার নিকট-আত্মীয়ের মতো ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী অন্যতম। কবি এবং কবিজায়া দুজনেরই ছিল স্নেহ-সমৃদ্ধ হৃদয়—পরকে আপন-করা প্রাণ। যতীন-দা'র বাড়ীতে গেলে আমি যেন তাঁর পরিবারবর্গের মধ্যে তাঁদেরই একজন হ'য়ে যেতাম। নদীয়া জেলার জমশেরপুরের বিখ্যাত বাগচী-পরিবারের সন্তান ছিলেন যতীন-দা,—জমশেরপুরের জমিদার। যতীন-দা একবার পূজোর সময় কলকাতা থেকে সপরিবারে জমশেরপুর যাচ্ছেন। আমাকেও ধরলেন তাঁদের সঙ্গে যেতে। প্রতিশ্রুতি দিলাম, 'যাবো'; কিন্তু তাঁদের সঙ্গে নয়, আমি যাবো আমার পল্লীবাসভূমি মুর্শিদাবাদ জেলার নিমতিতা থেকে রওনা হয়ে। যতীন-দা পূজোর দিন-পনরো পূর্বে সপরিবারে জমশেরপুর রওনা হলেন, আমি রওনা হলাম আমার পল্লীবাসে।

যতীন-দা আমাকে পথের নির্দেশ দিয়ে ব'লে দিয়েছিলেন, পদ্মার ওপরে একটি স্টিমার স্টেশনে নেমে জমশেরপুর যেতে হয়, সাত-আট মাইল পথ। আমি আগে খবর দিলে তিনি স্টেশনে তাঁদের হাতী পাঠিয়ে দেবেন। আরও একটি পথের সন্ধান দিয়েছিলেন, সেটা আরও দূর পথ।

ক্রমশঃ পূজোর দিন এগিয়ে এল। দেশে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে হৈ-হৈ ক'রে কাটানোতে যতীন-দা'কে আর চিঠি লেখা হ'য়ে উঠলো না। এদিকে আকাশ-ফুঁড়ে নামলো ঝড় আর বৃষ্টি। সেই দারুণ দুর্যোগের মধ্যে 'পরাণ-সখা বন্ধু হে আমার' ব'লে ঝড়ের রাতে আমার অভিসার জমশেরপুর অভিমুখে। আগে থেকে খবর দিতে পারিনি

ব'লে হাতীর আশা ছেড়ে দিতেই হ'লো। সেই দূর পথের স্টেশন অভিমুখেই রওনা হলাম। এটিও স্টিমারের পথ। দামুকদিয়া ঘাট স্টেশনে স্টিমার থেকে নেমে ট্রেনে চ'ড়ে কয়েকটি স্টেশন পরে নামলাম ভেড়ামারা স্টেশনে। সেখান থেকে গো-যানে জমশেরপুর-যাত্রা। বারো-চৌদ্দ মাইল পথ। রাস্তা বৃষ্টিতে কর্দমাক্ত। গাড়ীর চাকা ব'সে যাচ্ছে সেই কাদার মধ্যে। গরু দুটির আদৌ ইচ্ছে নেই এ-পথে চলতে, কিন্তু গাড়োয়ান তাদের চালাবেই ঠেঙিয়ে-ঠেঙিয়ে। এ আরামের যাত্রা ত্যাগ ক'রে গাড়ী থেকে নেমে পড়লাম। পদব্রজেই যাত্রা করলাম। সামান্য যা বাক্স-বিছানা ছিল, তাই নিয়ে গরুর গাড়ী আসতে লাগলো আমার পিছনে পিছনে।

তিন-চার ঘণ্টা অবিশ্রান্ত হেঁটে জমশেরপুরে পৌঁছলাম। যতীন-দা'র বাড়ী বাংলাদেশের প্রাচীনকালের জমিদারদের রুচিসম্মত বিরাট প্রাসাদ। পূজোর সময়, স্বভাবতঃই বাড়ীটে সরগরম হ'য়েই ছিল, আমি যাওয়াতে যতীন-দা এবং বাড়ীর ছেলেমেয়েরা আরও মেতে উঠলেন। যতীন-দা জমিদার হ'লেও জীবনে অনেক বৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন, কিন্তু তিনি বোধহয় কখনও প্রচারকের কাজ করেননি। তিনি যে কত বড় সুদক্ষ প্রচারক ছিলেন, সেটা বুঝতে পারলাম জমশেরপুর গিয়ে। আমাকে নিয়ে তিনি জমশেরপুরের বাড়ী-বাড়ী ঘুরতে লাগলেন। যেন আমার গলায় দড়ি বেঁধে ডুগডুগি বাজিয়ে যতীন-দা সারা গ্রামটিতে আমার প্রচারকার্য চালিয়ে বাড়ী ফিরলেন।

সমগ্র জমশেরপুর গ্রামটিকেই বাগচী-পরিবারের গ্রাম বললে অত্যুক্তি হয় না। একটি মহা মহীরুহের দিগন্তবিস্তৃত শাখাপ্রশাখা যেন সমগ্র গ্রামটিকে ছেয়ে রেখেছে। বাংলাদেশে এরূপ বৃহৎ পরিবার-অধ্যুষিত গ্রাম আর আছে কিনা জানিনে। গ্রামে শত শত

সুশিক্ষিত, সংস্কৃতিসম্পন্ন, কৃতবিদ্য ব্যক্তির বাস। তাঁদের মধ্যে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীও বহু। সন্ধ্যার পরে যতীন-দা'র বাড়ীতে বসলো গানের আসর। গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অনেকেই এসেছেন আমার গান শুনতে। আসরে এইরূপ শ্রোতার সমাবেশ যে হবে, এটা আমি আগেই যতীন-দা'র কাছ থেকে জেনে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনী সেন, নজরুল ইস্‌লাম প্রভৃতির কতকগুলি জনপ্রিয় গান গাইবো ব'লে মনে মনে ঠিক ক'রে রেখেছিলাম। কিন্তু যতীন-দা'র উদ্দেশ্য অন্যরূপ। এইসব শ্রোতাদের কাছে আমাকে অসাধারণরূপে জাহির করবার জন্যে যতীন-দা উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠলেন। তিনি শ্রোতাদের কাছে দেখাতে চান যে, আমি বাংলা গানের কত বড় প্রত্নতাত্ত্বিক। যতীন-দা আসরের মধ্যে ব'লে বসলেন, 'গাও তো ভায়া, প্রাচীন বাংলা-গান। চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি থেকে শুরু ক'রে শেষ করো রামপ্রসাদ-কমলাকান্ত-নীলকণ্ঠে।'

শ্রোতাদের মধ্যে দু'চারজন কলকাতায় আমার গান শুনেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, 'আমরা ওঁর হাসির গান শুনবো।'

যতীন-দা জবাব দিলেন, 'হাসির গানও গাইবে বইকি। সেকালে কি হাসির গান ছিল না? তুমি আরম্ভ করো ভায়া, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি থেকে।'

যতীন-দা'র সঙ্গে তাঁর কলকাতার বাড়ীতে একবার প্রাচীন বাংলা-গান সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ আলোচনা হ'য়েছিল। আলোচনার দিক দিয়ে এ-বস্তু সাহিত্যিকের কাছে উপভোগ্য হ'তে পারে, কিন্তু আধুনিক কালের সাধারণ শ্রোতাদের কাছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রাচীন বাংলা-গান সইবে কেন? যাই হোক, যতীন-দা'র কথামতো আমি গাইলাম: বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস থেকে আরম্ভ ক'রে দাশরথি, মধু কান, নিধুবাবু,

প্যারিমোহন কবিরত্ন, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, দেওয়ানমশায়, নীলকণ্ঠ প্রভৃতির গান। কবি, ঝুমুর, যাত্রার গানও বাদ গেল না। একমাত্র যতীন-দা'ই বোধহয় গানগুলি শুনে মুগ্ধ হলেন। অবশ্য যতীন-দা প্রত্যেকটি গানের পর বক্তৃতা দিয়ে শ্রোতাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন, যাতে তাঁরাও মুগ্ধ হন। কিন্তু আমার গানের সময় তাঁদের মুখমণ্ডলের ভাব-ব্যঞ্জনায় মুগ্ধ হবার কোনও লক্ষণ আমি দেখতে পাইনি। ঘণ্টা দুই গানের পর আসর ভাঙলো। দু'চারজন প্রবীণ ব্যক্তি আমার পিঠ চাপড়ে তারিফ করলেন বটে, কিন্তু বাদবাকী শ্রোতাদের দেখে মনে হ'লো তাঁরা যদি পিঠ চাপড়াতেন তাহ'লে সে-স্পর্শ আদৌ প্রশংসাব্যঞ্জক ব'লে অনুভূত হ'তো না।

নৈশ ভোজনান্তে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর শয্যাগ্রহণ ক'রে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হ'য়ে আছি। হঠাৎ একটি প্রবল ধাক্কায় ঘুম ভেঙে গেল। চোখ চেয়ে দেখি, যতীন-দা। যতীন-দা ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে বললেন, 'ওঠো, ওঠো,—যাত্রা আরম্ভ হ'য়ে গেল।'

তখনও প্রভাত হ'তে বোধ হয় ঘণ্টা দুই বাকি আছে। যাত্রার দলের ঐকতান-বাদন কানে এল। ঢোলের মেঘগর্জন আমার যে-নিদ্রা ভঙ্গ করতে পারেনি, সেই সুখনিদ্রাটি ভঙ্গ হওয়াতে বড়ই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। যতীন-দা টেনে নিয়ে চললেন যাত্রা শোনবার জন্যে। ঘণ্টা দুই যাত্রাভিনয় সম্ভোগ ক'রে এসে প্রাতঃকৃত্য ও প্রাতরাশ ইত্যাদি সমাপনের পর আবার যাত্রার উদ্দেশে যাত্রা।

যাত্রার পালা সাঙ্গ হ'লো আন্দাজ বেলা দশটায়। সেকালে যাত্রাভিনয়ে মুখ্য পালাটি শেষ হবার পর, কোনো কোনো আসরে একখানি ছোট প্রহসনের অভিনয় হ'তো। যাত্রাওয়ালারা এই প্রহসনের জন্যে হয়তো প্রস্তুত হবার আয়োজন করছিলেন, এমন সময়

যতীন-দা তাঁদের ম্যানেজারকে ডেকে এনে আমার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ ক'রে বললেন, 'আপনাদের আর 'ফার্স' করতে হবে না, সেটা ইনিই করবেন। চলুন, আমি আসরে গিয়ে শ্রোতাদের ব'লে আসছি।'

যতীন-দা আমাকে কোনো কথা বলবার অবকাশ দিলেন না, হনহন ক'রে চ'লে যাত্রার আসরের মধ্যে ঢুকে, আমার আসরে অবতীর্ণ হ'য়ে রঙ্গরস করার কথা শ্রোতাদের কাছে ঘোষণা ক'রে দিলেন।

যতীন-দা ফিরে এলে আমি বললাম, 'এ আপনি কী করলেন? এ আসরে কী ক'রবো আমি?'

যতীন-দা আমাকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'লাগিয়ে দাও তোমার 'কাঞ্চনতলার কাপ'। খুব জ'মে যাবে।'

যতীন-দা নাছোড়বান্দা। রাজী হ'তেই হ'লো 'কাঞ্চনতলার কাপ' গাইতে। এটি একটি ফুটবল-কাপ প্রতিযোগিতার বর্ণনামূলক গান— মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমাঞ্চলের গ্রাম্যভাষায় রচিত। আমারই লেখা। যতীন-দা খুব পছন্দ করতেন গানটি। কি আর করি, নেমে পড়লাম যাত্রার আসরে সাজপোশাক প'রে—খালি গা, পরনে লুঙি, হাতে লাঠি, মাথায় টুপি। আসরে নেমে যখন ভাবের অভিব্যক্তির সঙ্গে গান ধরলাম—

মামু হে, তু রোহলি ঘরে পোড়্যা,
দেখতে পালিন্যা,
হামি দেখ্নু, লয়ন ভোর্যা;

তখন দর্শকেরা আমাকে দেখবে কি যতীন-দা'কে দেখবে, তা ঠিক করতে পারছে না। যতীন-দা'র সে কী উল্লাস! অভিনয় শেষ ক'রে যখন আমি আসর থেকে বেরিয়ে এলাম, তখন যতীন-দা সাজঘরে ঢুকে

আমাকে একেবারে বুকে জাপটে ধরলেন। ভুজবন্ধন থেকে মুক্ত ক'রে উচ্ছ্বাসভরে বললেন, 'তোমাকে একটা বাঘ পুরস্কার দেবো, ঠিক করেছি।'

আমি বিস্মিত হ'য়ে বললাম, 'বাঘ!'

'হাঁ, বাঘ। আমি আয়োজন করছি। কালকেই আমরা বেরোবো শিকারে।'

আমি তো চিন্তিত হ'য়ে পড়লাম। বাঘ কিরে বাবা! যতীন-দা'র মুখ থেকে এ রকম উক্তি আমি আশাই করিনি।

পরদিন সত্যিই আয়োজন চলতে লাগলো শিকারে যাওয়ার। যতীন-দা'র আত্মীয়, নাম-করা শিকারী ভোলানাথ বাগচী হ'লেন দলপতি। মধ্যাহ্নভোজন সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আমরা হাতীর

ওপর চ'ড়ে বেরোলাম বাঘ-শিকারে। এ যেন একটা প্রমোদ-ভ্রমণ ব'লেই মনে হ'লো। কিন্তু এই প্রমোদ প্রমাদে পরিণত হ'তে বড় বেশী দেরি হ'লো না। এ অঞ্চলে যে বাঘ-লুকোনো জঙ্গল থাকতে পারে, সেটা আমার ধারণার অতীত ছিল। প্রায় মাইল পাঁচ-ছয় যাওয়ার পর সত্যিই একটা ভীষণ জঙ্গল মিললো। তাই তো! সত্যিই বাঘ আছে নাকি ?

যতীন-দা বললেন, 'জ্যান্ত বাঘ দেখনি ভায়া, আজ দেখবে; আলিপুরের চিড়িয়াখানায় আর সার্কাসের দলে যেসব বাঘ দেখেছ, তারা সব বেড়ালের বোনপো ব'নে গেছে,—জ্যান্তে মরা বাঘ। বনের স্বাধীন বাঘ,—দেখবে এক অদ্ভুত ব্যাপার। এ বাঘ যখন চায়, তখন চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়ে। এর হাঁ-এর মধ্যে দেখবে হিংস্র ক্ষুধার রূপ। এ বাঘ যখন বনের মধ্যে ছুটে চলে তখন চারদিকে বিদ্যুৎ খেলে যায়।'

বলা বাহুল্য, কবিবরের এ স্বাধীন-ব্যাঘ্র-বর্ণনা আমার কাছে আদৌ শ্রুতি-সুখকর বোধ হ'লো না। হাতী জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে প'ড়ে শুঁড় দিয়ে জাপটে ধ'রে, পা দিয়ে পিষে ফেলে ঝোপঝাড় পরিষ্কার করতে করতে বীরদর্পে এগিয়ে চলেছে। বাঘকে সে খুঁজে বের করবেই, এই রকম রোখ চেপেছে তার মাথায়। ব্যাপারটা আর সকলের পক্ষে উৎসাহজনক হ'লেও আমার পক্ষে ক্রমেই উদ্বেগপূর্ণ হ'য়ে উঠছে। কিছুদূর গিয়ে দেখি, জঙ্গলের মধ্যে একটি মরা ঘোড়া ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় প'ড়ে আছে;—চতুর্দিকের মৃত্তিকা তার রক্তে রঞ্জিত। বাঘের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর সন্দেহ রইলো না। প্রতি মুহূর্তেই মনে হ'তে লাগলো, কোনখান দিয়ে হঠাৎ বাঘ বেরিয়ে পড়ে বা। হাতী চলেছে। কিছুদূর গিয়ে দেখি, একটা বড় গাছের গুঁড়িতে

বাঘের থাবার চিহ্ন। প্রত্যেকটি নখচিহ্নের ভিতর সেই গাছের সদ্য-বের-হওয়া আঠা। মনে হ'লো দশ-পনরো মিনিট আগে বাঘটি নখ দিয়ে ঐ গাছটি আঁচড়িয়েছে। শিকারী ভোলানাথবাবুর উৎসাহের অন্ত নেই। বন্দুক বাগিয়েই আছেন। আমার কেবলই মনে হ'তে লাগলো, এ গেছো-বাঘ গাছের থেকেও হাতীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। হাওদাবিহীন হাতীর পৃষ্ঠদেশ আদৌ নিরাপদ স্থান নয়। ভগবানের নাম জপ করা ছাড়া আর পরিত্রাণের উপায় খুঁজে পেলাম না। ভগবান ভক্তের কাতর প্রার্থনা শুনলেন। সূর্যাস্তের কিছু পূর্বেই জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। শিকারী ভোলানাথবাবু বললেন, 'না, আজ শিকার মিললো না। সন্ধ্যা হ'য়ে এল। চলুন, ফেরা যাক।'

যতীন-দা ভগ্নোৎসাহ হলেন, আমার ধড়ে প্রাণ এল। কাজ নেই আমার পুরস্কারে।

'কাঞ্চনতলার কাপ' গানটি গেয়ে পুরস্কৃত হয়েছিলাম ব'লে যে একটুখানি গর্ব অনুভব ক'রবো, তার উপায় নেই। তিরস্কৃত হয়েছিলাম সঙ্গে সঙ্গে। জমশেরপুর থেকে কলকাতায় ফিরে এসে দেখি, নিমন্ত্রণ এসেছে আমার নিজেরই দেশ—মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থেকে। এইখানেই আমাদের স্বনামধন্য দাদাঠাকুর, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ী। আমার পল্লীবাস থেকে বারো মাইল। রঘুনাথগঞ্জে একটি প্রদর্শনীতে আমার গাইবার নিমন্ত্রণ। সেখানে গিয়ে দাদাঠাকুরেরই অতিথি হলাম। তিনিও এই অনুষ্ঠানে তাঁর হাস্যরস পরিবেশন করবেন। সকলেরই আগ্রহাতিশয্যে আমি 'কাঞ্চনতলার কাপ' গাইবো স্থির হ'লো।

অনুষ্ঠানটির অধিবেশনের স্বল্পকাল পূর্বে দাদাঠাকুরকে কাণ্ডারী ক'রে হাজির হলাম প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে। দস্তুরমতো সাজ-পোশাক প'রে অর্থাৎ পরনে লুঙি, মাথায় টুপি, হাতে লাঠি নিয়ে আরম্ভ করলাম 'কাঞ্চনতলার কাপ'। গান চলেছে—সকলেই যে উপভোগ করছে এটাও বেশ বুঝতে পারছি, এমন সময় একজন মুসলমান ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে উঠে আমার গানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করলেন। তাঁর বক্তব্য—এ গানে মুসলমান জাতিকে অপমান করা হচ্ছে, যেহেতু গায়কের মুসলমানী সাজপোশাক। সভায় গানের পরিবর্তে প্রতিবাদ আরম্ভ হ'লো। সকলেই সেই মুসলমান ভদ্রলোকটিকে অনুরোধ করলেন গানটি শেষ পর্যন্ত শোনবার জন্যে এবং তাঁকে বিশেষ ভরসা

দিয়ে বললেন, এ-গানের কোথাও মুসলমানের প্রতি অবমাননাকর কোনো উক্তি নাই। কিন্তু কেবা শোনে কার কথা! ভদ্রলোকটি

প্রতিবাদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজস্ব ভাষায় আমার উদ্দেশে যেসব শব্দ প্রয়োগ করলেন, সে-সব শব্দ কোনো বাংলা অভিধানে তো নাই-ই, উর্দু অভিধানে আছে কিনা বলিতে পারিনে। চুলোয় গেল গান। হৈ-হৈ হট্টগোলের মধ্যে পৈতৃক প্রাণটা ধড়ে নিয়ে ফিরে এলাম দাদাঠাকুরের বাড়ী। দাদাঠাকুর পৃষ্ঠপোষক হ'য়ে না-থাকলে পৃষ্ঠ রক্ষা করাই সেদিন দায় হ'তো।

তখন 'পাকিস্তান' কথাটারও বোধহয় জন্ম হয়নি।

এই রঘুনাথগঞ্জে দাদাঠাকুরের স্নেহ-শীতল ছায়ায় আমি কিছুকাল অতিবাহিত করেছিলাম। আমরা যে পাড়ায় থাকতাম, সেই পাড়াতেই তখনকার কালের জঙ্গিপুরের শ্রেষ্ঠ উকীল ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী। ইন্দ্রবাবু প্রবীণ ব্যক্তি। স্থানীয় সকলেরই সম্মানার্হ। ইন্দ্রবাবু একদিন সকালবেলায় তাঁর বাড়ীতে আমাকে ডেকে পাঠালেন। বাড়ীতে বিয়ে, বাইরের অনেক লোক এসেছে—আত্মীয়-স্বজন-কুটম্ব এবং বরযাত্রীর দল। ইন্দ্রবাবু তাঁদের নিয়ে বৈঠকখানায় ব'সে আছেন। আমি যাওয়ামাত্র তিনি আমাকে বললেন, 'ওহে বাপু, এঁদের দু'চারখানা গান শুনিয়ে দাও না।'

শ্রোতারা প্রায় সকলেই বয়োবৃদ্ধ। ইন্দ্রবাবুর প্রস্তাবে তাঁরা সকলেই সায় দিলেন। ইন্দ্রবাবু বললেন, 'আগে একটু চা খেয়ে নাও। চা আসছে।'

আমি ঘরের একটি কোণে চুপ ক'রে ব'সে আছি। প্রবীণ ব্রাহ্মণেরা তখন আমাদের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক অবনতি সম্বন্ধে আলোচনা চালিয়েছেন। আমাদের কালের যুবকদের শুচি-অশুচি,

স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, জাত-বেজাত কোনো বাছবিচার নেই, তাইতে দেশটা নাস্তিকে ভ'রে গেল। আর এই নাস্তিকতার জন্যে মূলতঃ দায়ী দেশের হোটেলগুলি, যেখানে জাতধর্মের তুবেলা সপিণ্ডকরণ হচ্ছে। জোর গলায় এই সব তত্ত্বের বিচার ও বিশ্লেষণ চলেছে, এমন সময় চা এল। উপস্থিত ভদ্রব্যক্তিদের সকলকেই এক এক পেয়ালা চা দেওয়া হ'লো। আমিও পেলাম এক কাপ।

সকলেই চা খেতে আরম্ভ করলেন, আমার পেয়ালাটি কিন্তু আমি স্পর্শও করলাম না। ইন্দ্রবাবু আমাকে বললেন, 'তাড়াতাড়ি চা খেয়ে নাও। হারমোনিয়ম আসছে।'

আমি বললাম, 'থাক্, চা আর খাবো না।'

'কেন, তুমি চা খাও না?'

আমি বিনয়-নম্র হ'য়ে বললাম, 'খাই, কিন্তু পেয়ালায় নয়—একটি পাথর-বাটিতে ক'রে দিলে খেতে পারি।'

ইন্দ্রবাবু বিস্মিত হ'য়ে বললেন, 'পাথর-বাটিতে চা! কেন বলো তো?'

'আজ্ঞে, ওতো মাটির পেয়ালা। ওকি জল দিয়ে ধুলে শুদ্ধ হয়? আপনার বাড়ীতে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের খাওয়াবার সময় যে মাটির গেলাসে জল দিচ্ছেন, সেই উচ্ছিষ্ট গেলাস আবার ধুয়ে নিয়ে তাতে জল খেতে পারা যায়?'

উপস্থিত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর কাপের চা তখনও একেবারে নিঃশেষ হয়নি। আমার ঐ কথাগুলির পর তাঁদের সমাজতত্ত্ব-বিশ্লেষণ বন্ধ তো হ'লোই, চায়ের পেয়ালাও মুখের কাছে কেউ তুললেন না।

ইন্দ্রবাবু একটু মুচকি হেসে একজন চাকরকে হুকুম করলেন, 'বাড়ীর ভেতর থেকে একটি পাথর-বাটি এনে তাতে ক'রে এক বাটি চা দিয়ে যা।'

গান গাইতে গিয়ে আমার 'মান-অপমান সবই সমান, দলুক না চরণতলে' গোছের অবস্থা অনেকবার হয়েছে। তার জন্যে যে দুঃখ পাইনি তা নয়। আমার গানে যারা দুঃখ পেয়েছে, তাদের উক্তিতে আমি দুঃখ পেয়েছি। দুঃখে দুঃখে কাটাকাটি করলে শেষ পর্যন্ত কারও দুঃখই থাকে না। আমার গান শুনে যারা উত্তেজিত হয়েছে, উচ্চরোলে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে, প্রকাশ্য সভায় গালমন্দ দিয়েছে, সোরগোল করেছে, ঘোঁট পাকিয়েছে—এদের মনোভাবটা বুঝি: আমার রসিকতায়, ব্যঙ্গে বা বিদ্রূপে এরা মর্মাহত হয়েছে। কিন্তু

এমনও দু'টি-একটি আসর ভাগ্যে জুটেছে যেখানে শ্রোতাদের গান ভালো লাগলো কি মন্দ লাগলো—কোনো-কিছুই বুঝতে পারলাম না। যেন নিতান্ত অনিচ্ছাক্রমে গান শুনছেন।

কলকাতা শহরেই একটি সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠানের বাঙালী কর্মচারীদের বিজয়া-সম্মিলনী। সেই সম্মিলনীর একজন উদ্যোক্তা রেডিয়ো অফিসে এলেন আমার কাছে, তাঁদের এই অনুষ্ঠানে গাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করতে। কেবল আমাকেই নয়, সেই আসরে আবৃত্তি করবার জন্যে তিনি বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রকেও ধরলেন। দু'জনেই রাজী হলাম।

দিনটি শনিবার। বীরেন্দ্র ভদ্র ও আমি দু'জনেই একসঙ্গে রেডিয়ো অফিস থেকে বেরোলাম। গঙ্গাতীরে একটি প্রকাণ্ড হলে সম্মিলনীর অধিবেশন। দেখে মনে হ'লো একটি মালগুদাম পরিণত হয়েছে হলে। আমাদের মতো মালের আমদানির জন্যে পূর্বসঞ্চিত মালগুলি বোধহয় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। হলের মধ্যে প্রবেশ করতেই হলধরদের মধ্যে একজন এক-একটি পুষ্পস্তবক উপহার দিয়ে আমাদের দু'জনকে যথাস্থানে নিয়ে গেলেন। আমরা গিয়ে দেখি, হলের যে-অংশে এই সম্মিলনীর বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সে-অংশটি লোকজনে ভর্তি হ'য়ে গেছে। এক একখানি চেয়ারে এক একজন শ্রোতা গম্ভীর মুখে ব'সে আছেন। অনেকেরই হাতে এক একটি চটের র‍্যাশন ব্যাগ ঝোলানো। দু'একজন চেয়ারের ওপরে পা দু'টি তুলেও ব'সে আছেন। চমৎকার আসর!

সম্মিলনীর কার্য আরম্ভ হ'লো। গোড়ায় দু'একজন দু'চার কথা বললেন। তার পরেই এল বীরেন ভদ্রের পালা। তিনি এতক্ষণ ব'সে ব'সে গলা শানাচ্ছিলেন। একখানি বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী হাতে নিয়ে তিনি দণ্ডায়মান হলেন। এর আগে কলকাতার নানা সুধী-সমাজে

তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'সুবর্ণগোলক' পাঠ ক'রে খুবই সুনাম অর্জন করেছিলেন। এখানে আরও খানিকটে সুনাম পাবার আশা নিয়ে 'সুবর্ণগোলক' পড়বেন স্থির ক'রে এসেছিলেন। হায় রে, আশা যে কুহকিনী—বীরেনবাবুর সেটা জানা ছিল না। তিনি উঠে এমন কায়দা ক'রে দাঁড়ালেন যে, আজকের আসর তিনিই মাৎ ক'রে দেবেন। সুবর্ণগোলক পড়তে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লাগে। দশ-পনরো মিনিট পড়ার পর শ্রোতাদের মুখে-চোখে যখন তিনি উপভোগের রেখাটি পর্যন্ত ফোটাতে পারলেন না, তখন আরো রসিয়ে রসিয়ে পড়তে লাগলেন। তবু শ্রোতাদের ভাবভঙ্গি পূর্ববৎ,—কাষ্ঠপুত্তলিকার মতো। প্রত্যেকটি শ্রোতা বাঙালী—বীরেনবাবু পড়ছেন একটি সরস গল্প বাংলাভাষায়—কিন্তু শ্রোতারা যেন হিব্রু কি গ্রীক শুনছেন, এইরূপ মুখভঙ্গি। এবম্প্রকার অবস্থা সত্ত্বেও বীরেনবাবু কিন্তু দমলেন না। তিনি দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে নারী-চরিত্রের কথাগুলি বামাকণ্ঠে ইনিয়ে-বিনিয়ে অভিনয়ের ঢঙে আবৃত্তি করতে লাগলেন। তাঁর চিত্তে যেন দৃঢ় সঙ্কল্প জেগেছে—শ্রোতাদের হাসাবেনই। কিন্তু শ্রোতারা যেন পরকালের চিন্তায় বিভোর! চোখের ওপর দিয়ে যে হাস্যরসের বান ডেকে যাচ্ছে, সেদিকে তাঁদের হুঁশ-ও নেই। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধ'রে ব্যর্থ প্রয়াস ক'রে বীরেনবাবু ব'সে পড়লেন। বীরেনবাবু বসবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শ্রোতা কিন্তু একসঙ্গে করতালি দিয়ে বীরেনবাবুকে অভিনন্দিত করলেন। কারণ, প্রথম করতালি দিয়েছিলেন সেদিনের আহ্বায়ক মহাশয়—অফিসের বড়বাবু।

তার পরেই এল আমার পালা। বীরেনবাবুর চেয়ে আমার বয়স বেশী। ঘা-খাওয়া লোক আমি। সুতরাং যত কম সময়ে সারতে

পারি, তারই চেষ্টা করলাম। দশ মিনিটে দু'টি হাসির গান সাঙ্গ ক'রে সেই শোকাবহ পরিস্থিতির মধ্যে স্বস্থানে উপবেশন করলাম। আমার গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আসর ভাঙলো। কালবিলম্ব না ক'রে শ্রোতারা সব পড়ি-কি-মরি হ'য়ে ছুট দিলেন।

আমরাও বেরোলাম আসর থেকে। পথে বেরিয়ে এসে বীরেনবাবু আমাকে বললেন, 'নলিন্' দা, কে এরা ?'

আমি বললাম, 'ডেলি প্যাসেঞ্জার।'

বীরেনবাবু বললেন, 'ডেলি প্যাসেঞ্জারদের কি রসবোধ থাকে না, আপনি বলেন ?'

'রসবোধ থাকবে না কেন, যথেষ্ট আছে। কিন্তু রস পান করার সময়-অসময় আছে তো ? ওদিকে ট্রেনের পর ট্রেন চ'লে যাচ্ছে, এদিকে সকলকে গুদামজাত ক'রে বড়বাবু দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছেন…'

বীরেনবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'দেখলেন, গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কি রকম ছুটলো সব।'

'শনিবার যে।'

এতো গেল চাকরি বজায় রাখার ব্যাপার। দেরি ক'রে বাড়ী গেলে গৃহিণী কুপিতা হন আর কথার অবাধ্য হ'লে বড়বাবু চটেন। এই দোটানায় প'ড়ে রসবোধ উবে যায়। কিন্তু যাদের এ-সব আতঙ্ক নেই, এমন একশ্রেণীর লোকেদের কথা বলি। সুশিক্ষিত, মার্জিতরুচি, আলোকপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের কথা।

এই কলকাতা শহরের গড়পারে একটি সভ্যতার নবারুণদীপ্ত

পরিবারে আমার হাসির গানের আসর। সন্ধ্যার পরে গানের আসর বসেছে। ক্ষুদ্র আসর। জন পনরো-কুড়ি শ্রোতা। তার মধ্যে মহিলা সাত-আট জন। তাঁরা সকলেই এসেছেন হাসির গান শুনতে। সকলেরই সমান আগ্রহ। শ্রোতাদের প্রায় সকলেই আমার সুপরিচিত। তাঁরা সুরসিক ব্যক্তি;—রসিকতা করতে জানেন, রসিকতার রসও গ্রহণ করতে জানেন। সুতরাং এ আসরে হাসির গানের কদর হবারই কথা। কিন্তু আমার বরাতে তা হ'লো না। আমি একটি ক'রে হাসির গান গাই, তাঁরা সকলে চুপটি ক'রে গান শোনেন গম্ভীর হ'য়ে—কোনো ভাবান্তর নেই। কোনো কোনো শ্রোতার দৃঢ়সংবদ্ধ

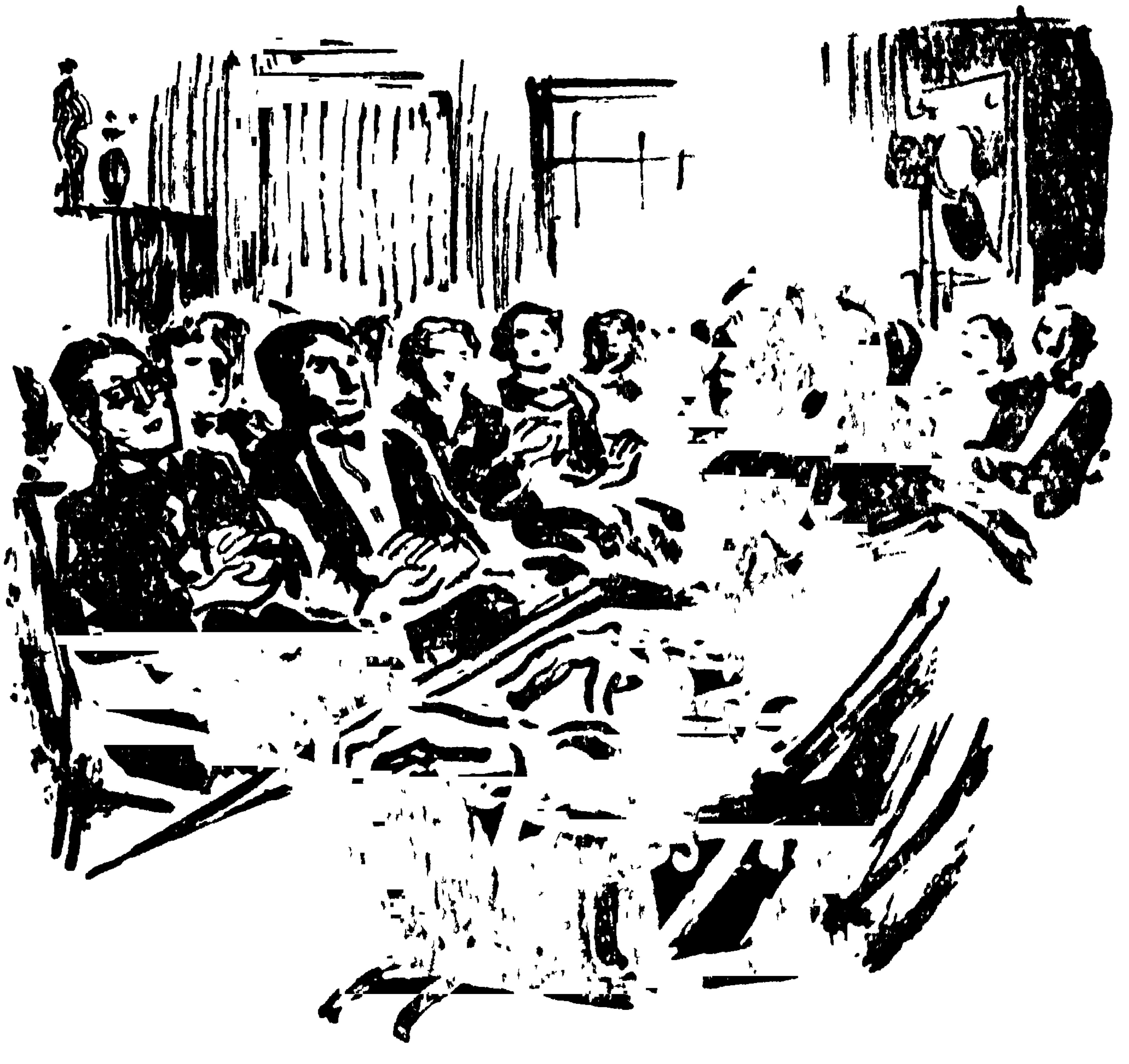

অধরোষ্ঠের দুটি প্রান্তবিন্দুতে অন্তরস্থ হাসির একটুখানি আমেজ

ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়ে ক্ষণপ্রভার মতো সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায়। কিন্তু গানটি শেষ হ'লে অনেকেই ব'লে ওঠেন, 'চমৎকার।' প্রত্যেক গানের বেলায় এই কাণ্ড!

এ যেন ঢাকের বাদ্যি—থামলেই চমৎকার!

এতক্ষণ যাঁদের গুণ গাইলাম, পাঁচজনের সম্মুখে না-হাসাটাই তাঁদের সভ্যতার একটি অঙ্গ। এবং এটি জ্ঞানোন্মেষের সময় থেকেই দস্তুরমতো প্র্যাক্‌টিস করতে হয়েছে। পাঁচজনে একত্র হ'লে হাসবার বস্তু দেখলেও তাঁরা হাসেন না, হাস্যকর কোনো-কিছু শুনলেও অন্তরের হাসির অনুমাত্র বাইরে প্রকাশ করেন না। আশ্চর্য এই—তাঁদের দেখে যে আর পাঁচজনে হাসে, সেটা তাঁরা বুঝতেই পারেন না। বুঝলে হয়তো রোগের প্রতিকার হ'তো।

আর-এক শ্রেণীর সভ্য সমাজে একবার গিয়েছিলাম গান করতে। আমাদের সেকালের তরুণ বন্ধু শৈলেনের বিয়েতে। শৈলেন খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বী,—ক্রিশ্চান সমাজেরই ক'নে। শৈলেনের বড় সাধ—তার বিয়ে উপলক্ষে একটি গানের আসর করে। দিলীপকুমার রায় তখন সবে বিলেত থেকে ফিরে এসে সারা কলকাতা শহরে গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন। শৈলেনের বড় ইচ্ছা, তার এই আসরে দিলীপকুমারকে যদি আনতে পারা যায়। কিন্তু অতদূর না এগুতে পেরে, হাতের কাছে পেয়ে সে আমাকেই ধ'রে বসলো গানের জন্যে। আমি তখন আটপৌরে গাইয়ে—সহজলভ্য। সহজেই রাজী হ'য়ে গেলাম। বিয়ের দু'তিন দিন পরে একটি বৈকালিক চা-চক্রে গানের ব্যবস্থা হ'লো।

এণ্টালী অঞ্চলের একটি বাড়ীতে সেই চা-চক্রে গিয়ে হাজির হলাম। নববধূকে সঙ্গে নিয়ে শৈলেন ফটকের সামনেই দাঁড়িয়ে। আমি যেতেই তারা দু'জনে করমর্দন ক'রে আমাকে নিয়ে গিয়ে তুললো দোতলার ওপরে একটি হল-ঘরে। সেখানে প্যাণ্ট-কোট-গলাবন্ধ-শোভিত কৃষ্ণাঙ্গ সাহেব এবং গাউন-ফ্রক-সজ্জিতা কৃষ্ণাঙ্গী বিবিরা সারিবদ্ধ হ'য়ে ব'সে আছেন এক একখানি চেয়ারে। চেহারায় ও চালচলনে মনে হ'লো সকলেই বাঙালী। হলের এক প্রান্তে শুভ্রবস্ত্রাবৃত টেবিলের ওপর একটি হারমোনিয়ম। শৈলেন আমাকে নিয়ে গিয়ে সেই টেবিলের সন্নিকটে একটি চেয়ারে বসিয়ে দিলে। আর সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করলে বক্তৃতা। বক্তৃতার বিষয়-বস্তু আমি। আমার এমনই পরিচয় সে সকলকে দিলে যে, সকলে মনে ক'রলো, কি সাহিত্যে, কি সঙ্গীতে এতবড় শক্তিধর মহাপুরুষ বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত জন্মায়নি। শৈলেনের কথাগুলি সকলেই গম্ভীর হ'য়ে শুনলেন এবং মনে হ'লো তাঁরা বাংলাদেশের এত বড় লোকটিকে দেখে খুশীই হয়েছেন।

শৈলেন আমাকে গান গাইতে আহ্বান ক'রলো। ফাল্গুন মাসে বিয়ে। আমি গোড়াতেই গাইলাম রবীন্দ্রনাথের 'আজি দখিন দুয়ার খোলা' গানটি। গানটি শেষ হ'তেই একজন শ্রোতা বেশ কায়দাদুরস্ত হ'য়ে চেয়ার ছেড়ে আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'এ-গানটি কি আপনার রচনা ?'

আমি কিছুক্ষণ তাঁর দিকে হাঁ ক'রে চেয়েই রইলাম। পরে বললাম, 'না, এটি রবীন্দ্রনাথের গান।'

ভদ্রলোক মুরুব্বির মতো গম্ভীর হ'য়ে বললেন, 'রবি ঠাকুরের ? আজকাল রবি ঠাকুর আর দিলীপ রায় খুব নাম করেছে।'

যার স্বধর্ম হ'লো বাংলাগান, সে ইংরেজী 'গান' (gun) ধরলে সেটা যে নিতান্তই হয় পরধর্ম, আর তার পরিণাম যে অত্যন্ত ভয়াবহ হ'য়ে ওঠে—এটা একদিন অস্থিমজ্জায় অনুভব করেছিলাম।

বাংলাদেশের অগ্নিযুগের কথা। দিব্যি গান গেয়ে, হেসে-খেলে দিনগুলি যাপন করছিলাম, হঠাৎ অনুকূলবাবু আনুকূল্য প্রদর্শন ক'রে কেন যে আমাকে বিপ্লবী দলে টেনে নিলেন, তা তিনিই জানেন। এই অনুকূলবাবু যে কে, ভবিষ্যৎ-জীবনে তার কোনও সন্ধান পাইনি। অত্যন্ত সঙ্গোপনে বিপ্লবী দলের কাজ ক'রে চলেছি, আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব সকলের দৃষ্টির অন্তরালে।

এই সময়ে আমি একজন অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের ছেলেকে প্রাইভেট পড়াই। ছাত্রটি নিতান্ত ছেলেমানুষ—বয়স বোধ হয় আট-দশ বৎসর। সেই বাড়ীতে একদিন দেখি, বাড়ীর চাকরটি তার মুনিবের বন্দুক-রিভলভার বের ক'রে ঘষে-মেজে বেশ পরিষ্কার করছে। এঁদের রিভলভারের অনুরূপ একটি রিভলভার আমারও ছিল। হঠাৎ একদিন আমার মাথায় দুর্বুদ্ধি গজালো যে, হাকিমসাহেবের ভাণ্ডার থেকে কিছু কার্তুজ সংগ্রহ করতে হবে। একদিন তাঁর এই আগ্নেয়াস্ত্র রাখবার স্থানটিও আবিষ্কার করলাম। আর আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই স'রে পড়লাম কতকগুলি কার্তুজ নিয়ে। কিন্তু এত কাণ্ড ক'রে সেগুলিকে কাজে লাগাতে পারলাম না। আমার রিভলভারের ঘর-গুলির খোপের সঙ্গে কার্তুজগুলি খাপ খেলো না। পরদিন যখন ছাত্র পড়াতে গেলাম, তখন কার্তুজগুলি সঙ্গে নিয়েই গেছি। ইচ্ছা—যেখানকার বস্তু, সেখানেই রেখে দেবো। কিন্তু এ-দিনে দেখি, সে-ঘরটি

বাইরের থেকে তালা-বন্ধ। প্রত্যহ পড়াতে যাবার সময় কার্তুজগুলি সঙ্গে নিয়ে যাই, কিন্তু ঘরটি আর খোলা পাইনে। অবশেষে ঐ ঘরেরই সন্নিহিত একটি কক্ষের এক কোণে কাগজে মুড়ে কার্তুজ ক'টি রেখে দিলাম। এর প্রায় দিন দশ-বারো পরে একদিন ছাত্রটি আমাকে জানালে, বাড়ী থেকে কার্তুজ চুরি গেছে। তার বাবা অনেককেই সন্দেহ করেছেন, তাদের মধ্যে আমিও একজন। পরদিন গিয়ে

শুনলাম, থানায় খবর দেওয়া হ'য়েছিল। পুলিশ এসেছিল তদন্ত করতে। সন্দেহভাজনদের নামও তাদের জানানো হয়েছিল। কিন্তু পুলিশই একটি ঘরের কোণ থেকে কার্তুজগুলি আবিষ্কার করেছে।

পুলিশের নেকনজর যে আমার ওপর ছিল না, তা নয়। কিন্তু তারা আমাকে বিপ্লবীদলের লোক ব'লে সন্দেহ ক'রতো না। আমি

স্বদেশী গান গাই, স্বদেশী সভাসমিতিতে হৈ-হুল্লোড় করি—আমার এই রূপটিই বর্তমান ছিল পুলিশের চোখের সম্মুখে। কিন্তু এই কার্তুজের ব্যাপারের পর থেকে তারা যেন আমাকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো। আসল কাজে অসুবিধা হচ্ছে দেখে স্থানীয় পুলিশের চোখ এড়িয়ে কিছুদিন অন্তরালে থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। এই সময় দেখলাম, মানুষ কারে পড়লে হেন-কাজ-নেই যা করতে পারে না। বিপ্লবীদলের একজন বন্ধুকে নিয়ে একদিন বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বাড়ীতে ব'লে গেলাম চাকরির চেষ্টায় বেরুচ্ছি। একটি গুরুট্রেনিং স্কুলে দু'মাসের জন্যে একটি শিক্ষকের প্রয়োজন হ'য়েছিল। ভাগ্যক্রমে পেয়ে গেলাম সেই কাজটি। দেখতে দেখতে চোখের ওপর দিয়ে দু'টি মাস অতিবাহিত হ'য়ে গেল। শিক্ষকতার প্রশংসাপত্র ও যৎকিঞ্চিৎ অর্থ পকেটস্থ ক'রে সেখান থেকে রওনা হলাম অপর একটি ঘাঁটিতে। সেখানে একজন যোগাড় ক'রে দিলেন হোরমিলার স্টিমার কোম্পানীর একটি স্টেশনের স্টেশন-মাস্টারি। স্টিমার-যাত্রীদের মধ্যে মাঝে মাঝে দু'চারটি চেনা-মুখের আবির্ভাব হয় দেখে, এ কাজটি নিজে থেকেই ছেড়ে দিতে হ'লো। এর পর মিললো একটি অদ্ভুত কাজ—একেবারে প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। ঢুকলাম একটি জমিদারী এস্টেটে সার্ভেয়ার হ'য়ে। জমি মাপজোখের কিছুই জানিনে, এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র শিক্ষা নেই, তবু একটি মাস মাঠে মাঠে শেকল নিয়ে ঘুরে বেড়ালাম। অতঃপর আবার একটি স্কুল-মাস্টারি জুটে গেল। মালদহ জেলার কোনো একটি স্কুলে একটি শিক্ষকের পদ খালি ছিল। খবরের কাগজে কর্মখালির বিজ্ঞাপনে সেটি দেখে একখানা দরখাস্ত ক'রে দিয়েছিলাম। গুরুট্রেনিং স্কুলের শিক্ষকতায় অভিজ্ঞ—এ-কথা জোর দিয়ে লিখেছিলাম, আর সেই দরখাস্তের সঙ্গে জুড়ে

দিয়েছিলাম গুরুট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষকের প্রশংসাপত্রখানি। অবিলম্বে দরখাস্ত মঞ্জুর হ'য়ে গেল। গেলাম মালদহের সেই পল্লীগ্রামে। স্থানীয় জমিদারবাবু স্কুলের সেক্রেটারি। তাঁর একটি ছেলেকে পড়ানোর বিনিময়ে তাঁরই বাড়ীতে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা হ'লো। সেখানে বেশ আসর জমিয়ে বসলাম। ছাত্রদের অভিভাবকেরা অনেকেই আমাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করলেন। আশপাশের গ্রামগুলিতেও বেশ পসার-প্রতিপত্তি হ'লো। এইরূপে নিশ্চিন্ত মনে পুরো একটি বৎসর কাটাবার পর সেক্রেটারি মহাশয় আমাকে জানালেন যে, তাঁর যে-পুত্রটি আমার কাছে প্রাইভেট পড়ে, তার সম্বন্ধে কিছু বলবেন।

একটি নির্জন কক্ষে তিনি আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। আমি ঘরে ঢুকতেই সসম্মানে বললেন তাঁর কাছে বসতে। তাঁর চাল-চলন যেন একটু অস্বাভাবিক ব'লে মনে হ'লো,—মুখে চোখে ভয়ের চিহ্ন। আমাকে বললেন, 'ছেলেটি আমাকে বড় ভাবিয়ে তুলেছে মাস্টারমশায়। তার ওপর বড় আশা করেছিলাম!'

আমি বললাম, 'কেন, কী হ'লো?'

ভদ্রলোক সে-কথার কোনো উত্তর না দিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি স্বদেশীদলের লোক?'

আমি তো চিন্তিত হ'য়ে পড়লাম। পুরো একটি বৎসর যে-প্রশ্ন ভদ্রলোকের মনে জাগেনি, আজ কী এমন ঘটলো, যাতে স্বদেশীদলের লোক ব'লে তিনি আমাকে সন্দেহ করলেন! তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বললাম, 'কেন এ-কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন? আমি কোনো দলের-টলের লোক নই, মশায়। তবে দেশের কথা ভাবি, দেশের কল্যাণ কামনা করি।'

সেক্রেটারি বললেন, 'তা কি আমরাই করিনে? কিন্তু ছেলেটার এ মতিগতি হ'লো কী ক'রে? সে তার মায়ের কাছে আজ বলেছে, দেশের স্বাধীনতার জন্যে সে প্রাণ দিতে পারে। তার মা তো কেঁদে-কেটে অস্থির। তাঁর ধারণা হয়েছে, আপনিই ছেলেটিকে এই সব শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি তো আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছেন। আপনি আমাকে রক্ষা করুন, মাস্টার মশায়।'

'আমি কী করতে পারি বলুন?'

সেক্রেটারি বললেন, 'আপনি ছেলেটিকে বুঝিয়ে বলুন, যেন ও-পথে না যায়।'

আমি তখন বললাম, 'তার চেয়ে আর একটি কাজ করি, যাতে আপনার স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হন। আমিই বরং এ স্কুলের কাজ

ছেড়ে অন্যত্র চ'লে যাই। আমাকে আপনি একমাস সময় দিন, আমি এর মধ্যে কোথাও একটা কিছু যোগাড় ক'রে চ'লে যাব।'

ঠিক এক মাস পরে সত্যিই চাকরিটি ছাড়লাম। নতুন কাজ আর একটি যোগাড় হ'লো ঐ মালদহ জেলাতেই। এ এক অপরূপ বৃত্তি। এ-কাজের পরিণতির দিনে আয়নাতে নিজের চেহারা দেখে নিজেই হেসে বাঁচিনে। স্কুল-মাস্টারের ধুতি-পাঞ্জাবি-চাদর ছেড়ে দুটি পায়ে পরেছি মোজা, পরনে পায়জামা, গায়ে চোগা-চাপকান। বলুন দেখি বৃত্তিটি কি?—মাদ্রাসার মৌলভী? উর্দু-ফাসির বর্ণপরিচয়ই হয়নি, মাদ্রাসার মৌলভী হবো কি ক'রে? তবে?—উকিল-মোক্তার? ও-দুটি কার্য করতে গেলে ওকালতি-মোক্তারি পাস করতে হয়। আমি যে ও-পথ মাড়াইনি মশায়। তবে শুনুন, স্কুল-মাস্টারি ছেড়ে ঢুকে পড়লাম একটা যাত্রার দলে। যাত্রার দলের জুড়ি সেজে যে-দিন সর্বপ্রথম আসরে নামলাম, সেদিন সত্যিই নিজের চেহারা দেখে নিজেই হেসে বাঁচিনে। হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবীর-পতন'-এ জুড়ি আর অহিভূষণ স্যান্যালের 'সুরথ-উদ্ধার' নাটকে 'দিবোদাস' পাগলার অভিনয় ক'রে একদিন যাত্রার দল ছেড়ে দিলাম। চ'লে এলাম সটান কলকাতায়।

কলকাতায় এসে দিনকতক বিশ্রাম করলাম। একদিন একজন বন্ধু বললেন, 'হোটেলের ম্যানেজারি করবে?'

'কেন ক'রবো না? ঐটেই বা বাকি থাকে কেন?'

'চলো তবে।'

বন্ধুটি আমাকে সঙ্গে ক'রে আপার সার্কুলার রোডে কাশিমবাজার মহারাজার বাড়ীর বিপরীত দিকে একটি বাড়ীর দোতলায় উঠলেন। দ্বিতলের একটি কক্ষে আমাকে নিয়ে প্রবেশ ক'রে একজন বৃদ্ধ

১১

ব্যক্তিকে বললেন, 'দেখুন তো, এঁকে দিয়ে আপনার হোটেলের ম্যানেজারের কাজ চলবে কি না।'

ভদ্রলোক আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে বন্ধুটিকে বললেন, 'তুমি যখন নিয়ে এসেছ, তখন আর চলবে না? একটু ছেলেমানুষ ব'লে মনে হচ্ছে, তা হোক; কিন্তু কোনো স্পেশ্যাল কোয়ালিফিকেশন আছে কি?'

বন্ধুটি বললে, 'গান-বাজনা জানে।'

ভদ্রলোক উৎসাহিত হ'য়ে বললেন, 'তাই নাকি? তা'হলে একটু শোনাই যাক্‌ না?'

—ব'লে তিনি অন্দরমহলে প্রবেশ করলেন। অল্পক্ষণ পরেই এলো হারমোনিয়ম আর সেই সঙ্গে এলেন তিনি, তাঁর স্ত্রী ও কন্যা।

এতক্ষণ আমি নীরবে একটি কোণে ব'সে আছি। ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রী-কন্যাকে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন আমার বন্ধুর পরিচয়ে। হোটেলের ম্যানেজারের পদপ্রার্থী এ-কথাটা আর বললেন না। বরং আমার বন্ধুটিকে বললেন, 'তোমার বন্ধুটি কিন্তু বড় লাজুক মনে হচ্ছে।'

বন্ধুটি মুচকি হাসি হেসে বললো, 'কি রকম লাজুক, তা গান গাইবার সময়েই টের পাবেন।'

বৈঠকখানা ঘরে ব'সলো গানের আসর। ঘণ্টা দেড়েক গাইলাম কীর্তন থেকে হাসির গান পর্যন্ত। আসর ভাঙার পর ভদ্রলোক আমাকে বললেন, 'হোটেলের ম্যানেজারি সম্বন্ধে আপনার কোনো অভিজ্ঞতা আছে কি? না থাক, তাতে বিশেষ যায়-আসে না। আমার হোটেল কলকাতার দিশী হোটেলের মতো নোংরা হোটেল নয়। পুরীর ভিক্টোরিয়া ক্লাবের নাম শুনেছেন? সেই ভিক্টোরিয়া ক্লাবই হচ্ছে আমার হোটেল। সেখানে আপনাকে যেতে হবে। যাবেন?'

আমি তো চাকরি নেবার সঙ্কল্প ক'রেই এসেছি। পুরীর নামটি শুনে আগ্রহ আরও বাড়লো। তাঁকে বললাম, 'কেন যাব না।'

ভদ্রলোক বললেন, 'তাহ'লে শুনুন, আপনার ডিউটির কথাটা আগে বলি। দু'টি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট আপনি পাবেন। তারাই সব কাজকর্ম করে। আপনার কাজ বোর্ডারদের সুখসুবিধের ওপর দৃষ্টি রাখা, তাদের আনন্দ দেওয়া—তা আপনি পারবেন। তারা ভবিষ্যতে পুরীতে এলে ভিক্টোরিয়া ক্লাবেই যেন ওঠে, এইরকম সম্বন্ধ গ'ড়ে তুলবেন তাদের সঙ্গে।'

—ইত্যাদি উপদেশ দিয়ে, একটা বেতন স্থির ক'রে রেলভাড়া ইত্যাদি দিয়ে তিনি আমাকে পুরী পাঠিয়ে দিলেন। পুরীতে গিয়ে ভিক্টোরিয়া ক্লাবের ম্যানেজার হ'য়ে বসলাম। একেবারে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কাজ। বোর্ডারদের সঙ্গে বেশ ভাব হ'য়ে গেল। বিকেল-বেলায় চমৎকার একটি আড্ডা ব'সতো। তাতে পুরীর কয়েকজন তরুণ বাঙালীও এসে যোগ দিতেন। এই তরুণদের মধ্যে ছিলেন এখনকার একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি,—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিদ্যার অধ্যাপক ও মহাত্মা গান্ধীর বাংলাভাষার শিক্ষক শ্রীযুক্ত নির্মলকুমার বসু।

বড় আনন্দে কাটছিল পুরীর দিনগুলি। প্রায় ছ-সাত মাস হোটেলের ম্যানেজারি করছি, হঠাৎ একদিন একখানা জরুরী টেলিগ্রাম পেলাম। মাসীমার আদেশ, 'শীঘ্র বাড়ী এস, ভগবতীর মুক্তি আসন্ন।'

মাসীমাই আমার সংসারের কর্ত্রী। আমার মায়ের মৃত্যুর পর মাসীমা তাঁর একটি শিশুপুত্রকে নিয়ে এসে আমার সংসারের ভার

গ্রহণ করেন। এই শিশুপুত্রই ভগবতীচরণ। ভগবতীকে আমার সহোদর ব'লে জানতো অনেকে। ভগবতী বহরমপুর কলেজে পড়বার সময় বিপ্লববাদী সন্দেহে গ্রেপ্তার হ'য়ে নোয়াখালি জেলার কোম্পানীগঞ্জ থানার একটি গ্রামে আটক হ'য়ে আছে অনেক দিন।

পুরী থেকে বাড়ী এসে শুনলাম—ভগবতীর মুক্তির জন্যে মাসীমা গবর্নমেণ্টের সঙ্গে পত্রালাপ করেছিলেন। সর্বশেষে গবর্নমেণ্ট ভগবতীর সঙ্গে পরিবারস্থ যে-কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার মঞ্জুর করেছে। এই সাক্ষাৎকারের জন্যেই জরুরী তার ক'রে আমাকে ডাকা। অতএব নোয়াখালি যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হলাম।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে বহরমপুরে গিয়ে মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করলাম। ভগবতীর কাছে মাত্র দুটি দিন থাকবার অনুমতি মিললো।

ছুটলাম নোয়াখালি অভিমুখে। বাষ্পীয় যানে স্থলপথ ও জলপথ অতিক্রম ক'রে একদা এক প্রভাতকালে নোয়াখালি পৌঁছলাম। স্টেশনেই খবর নিয়ে জানলাম, কোম্পানীগঞ্জ—যেখানে আমার ভাই আটক আছে—নোয়াখালি থেকে পনরো-ষোলো মাইল পথ। গোরুর গাড়ী ছাড়া অন্য কোনো যানবাহনের ব্যবস্থা নেই।

সকালবেলায় নোয়াখালি শহরের একটি হোটেলে স্নানাহার সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর পদব্রজেই গুটি-গুটি রওনা হলাম কোম্পানীগঞ্জ অভিমুখে। অপরাহ্নে—সন্ধ্যার কিছু পূর্বে—আমার গন্তব্য-স্থানের সন্নিকটে দেখতে পেলাম একটি রাস্তার মোড়ে শ্রীমান ভগবতীচরণ দাঁড়িয়ে আমারই আগমন প্রতীক্ষা করছে। সে আমাকে তার বাসস্থানেই নিয়ে যাবে বলায়, আমি তাকে বললাম, 'এটা যে বে-আইনী হবে। আগে থানায় গিয়ে আমার হাজিরা দেওয়া দরকার।'

ভগবতী বললে, 'ও-সব আপনাকে ভাবতে হবে না। আগে আমার বাসাতেই চলুন। সেখানে একটু বিশ্রাম ক'রে থানায় যাবেন। ইনস্পেক্টর আমার বন্ধুলোক—চিন্তার কোনও কারণ নেই। তা ছাড়া তাঁকে আমার বলাও আছে, আপনি প্রথমে আমার বাড়ীতেই উঠবেন।'

ভগবতীর বাড়ীতে স্নানাদি সমাপন ক'রে চা ও জলযোগের পর থানায় গেলাম। থানার ইনস্পেক্টর যেন তাঁর কোনো নিকটতম আত্মীয়কে অভ্যর্থনা করবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়েই ছিলেন। আমার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাকে 'দাদা' ব'লে সম্বোধন করলেন। সেখানে আরও একজন বিপ্লবী বন্দী অবস্থায় ছিলেন। চুণীলাল তাঁর নাম। মনে হ'লো—ভগবতী আর চুনীলাল, এই দুটি বিপ্লবীতে সারা কোম্পানীগঞ্জ আর তার আশপাশের গ্রামগুলির অধিবাসীদের সকলকেই একান্ত আপনার ক'রে নিয়েছে। থানার ইনস্পেক্টর থেকে কনেস্টবলটি পর্যন্ত সকলেই যেন তাদের স্নেহ ও সততায় বশীভূত। ইনস্পেক্টরটি আমাকে বললেন, 'দাদার কথা অনেক শুনেছি ভগবতীবাবুর কাছে। আজ বিশ্রাম ক'রে নিন, কাল কিন্তু গান শোনাতে হবে।'

সন্ধ্যা ছ'টা থেকে ভোর ছ'টা পর্যন্ত রাজনৈতিক বন্দীরা তাদের বাড়ীর বা'র হ'তে পারে না। দেখলাম, এরা এখানে এ আইন মানে না। সন্ধ্যার পরেও ঘণ্টা দুই থানায় কাটিয়ে ভগবতীর বাড়ীতে ফিরে এলাম। রাত্রিটি বিশ্রামে কাটলো। পরদিন সকালবেলায় ভগবতীকে বললাম, 'মাত্র দুটিদিন তোমার কাছে থাকবার অনুমতি পেয়েছি। এই দুটি দিন পুরো আটচল্লিশ ঘণ্টা কি না, একবার ইনস্পেক্টরকে জিজ্ঞাসা কোরো। তা যদি না হয়, তাহ'লে আজই আমার শেষ দিন।'

ভগবতী বললে, 'কাল তো আপনি সন্ধ্যার একটু আগে এসেছেন। আপনি আজ আর কাল দু'দিন থাকবেন। আমি ইনস্পেক্টরকে ব'লে দেবো।'

পর পর পুরো দুটি দিনই থাকলাম। দু'দিনই থানাতে গানের আসর বসলো সন্ধ্যার পর। শেষ দিনের আসরে গানের পর আমি শ্রোতাদের বললাম, 'কাল আমি চ'লে যাচ্ছি।'

ইনস্পেক্টর স্বয়ং বললেন, 'না দাদা, কাল যাওয়া হতেই পারে না।'

আমি বললাম, 'মাত্র দুটি দিন থাকবার অনুমতি পেয়েছি। সে-স্থলে আড়াই দিন থাকা হ'য়ে যাচ্ছে। এর পর না গেলে আপনিই হয়তো গ্রেপ্তার করবেন।'

ইনস্পেক্টর হেসেই উত্তর দিলেন, 'দুদিনের জায়গায় আড়াই দিন থেকে অপরাধ তো ক'রেই ফেলেছেন। সুতরাং যদি নিতান্তই না থাকেন, তাহ'লে গ্রেপ্তার ক'রেই আপনাকে রাখতে হবে।'

এই কথা ব'লে তিনি মিনতিপূর্বক বললেন, 'তা হয় না দাদা, আর দুটি দিন থেকে যান।'

আমি বললাম, 'কিন্তু গবর্নমেণ্টের হুকুম যে মাত্র দুটি দিন থাকবার।'

ইনস্পেক্টর বললেন, 'কবে থেকে?'

'যেদিন এখানে এলাম, সেদিন থেকে।'

ইনস্পেক্টর কুটিল হাসি হেসে বললেন, 'কিন্তু আপনি যে এখনও আসেননি দাদা!'

আমি আশ্চর্য হ'য়ে বললাম, 'তার মানে?'

হেসেই ইনস্পেক্টর উত্তর দিলেন, 'আপনাকে খাতায় জমাই করিনি। আপনার এখানে পৌঁছবার তারিখ, বার, সময় সব আমাদের

খাতায় লিখে রাখতে হয়। আপনার আগমন-বার্তা হিসেবে যে তারিখটি লেখা থাকবে, আইনের দৃষ্টিতে সেই তারিখেই আপনি এখানে এসেছেন। ও কার্যটি আমি এখনও করিনি। কালকে

আপনাকে খাতায় জমা করবো, আর তার দু'দিন পরে আপনাকে খরচ লিখবো। সুতরাং কাল থেকে দুটি দিন এখানে থাকা আপনার আইনতঃ প্রাপ্য।'

আমি তাঁকে বললাম, 'আপনার চাকরির ভয় নেই?'

তিনি আবার হেসেই বললেন, 'খাতাপত্র ঠিক থাকলে চাকরি মারে কে?'

আরো দুটি দিন আনন্দে কাটিয়ে কোম্পানীগঞ্জ থেকে বিদায় নিলাম।

আমার বিপ্লবী জীবনে একজন পুলিশ অফিসারের স্নেহ চিরস্মরণীয় হ'য়ে আছে। এই পুলিশ অফিসারের নাম—প্রভাতচন্দ্র দত্ত। গান শুনতে তিনি খুব ভালোবাসতেন। সবের ওপর তিনি ছিলেন একজন সুরসিক ব্যক্তি। প্রভাত-দা বিশ্বাস করতেন না যে, আমি বিপ্লববাদী দলের লোক। আমার সম্বন্ধে বহু তদন্ত এসেছে গোয়েন্দাবিভাগ থেকে, প্রভাত-দা সমস্ত অভিযোগ খণ্ডন ক'রে আমাকে রক্ষা করেছেন। তবু আমাদের দলের দু'চারজন বিপ্লবীবন্ধু প্রভাত-দা'র প্রতি সন্দেহ পোষণ করতো। কারণ, তাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলে, কালো কখনো সাদা হ'তে পারে না। সুতরাং পুলিশ ভালো লোক হবে কি ক'রে?

আমি যে-সময়ের কথা বলছি, তখন প্রভাত-দা' মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার পুলিশ ইনস্পেক্টর। ভাগীরথীর দক্ষিণ পারে রঘুনাথ-গঞ্জ থানা এবং থানার পাশেই প্রভাত-দা'র বাসস্থান। সেই সময় রঘুনাথগঞ্জে আমাদের বিপ্লবী দলের একটি আস্তানা ছিল। এই আস্তানাটি ছিল পলাতক বিপ্লবী আসামীদের আবাসস্থান। লোকচক্ষুর অগোচরে এই পলাতক বিপ্লবীদের তত্ত্বাবধান করা, তাঁদের সুখ-সুবিধের ব্যবস্থা করা—এগুলি ছিল আমার কাজ। কিন্তু সে-বাড়ীর সঙ্গে আমার কোনও প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল না। আমি কোনোদিন সে বাড়ীতে প্রবেশও করিনি। দু'একজন বিপ্লবী আমার কাছে নিয়মিত আসতেন কোনো একটি কাজের অছিলায়।

আমি থাকি দাদাঠাকুরের (শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত) 'পণ্ডিত প্রেস'এর বাড়ীতে, তাঁর ছাপাখানা আর 'জঙ্গিপুর সংবাদ' কাগজখানির পরিচালনার জন্যে একজন কর্মী হ'য়ে। বলা আবশ্যক যে, আমাদের

দাদাঠাকুরের সঙ্গে ছিল প্রভাত-দা'র আত্মীয়জনসুলভ অন্তরঙ্গতা। তাঁদের পরস্পরের মধ্যে একটা নিবিড় প্রীতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত ছিল।

একদিন বৈকালে আমার কাছে এসেছেন কাশীর ষড়যন্ত্র মামলার পলাতক আসামী গোপেশচন্দ্র রায়। গোপেশচন্দ্রের মাথার ওপরে তখন বহুবিধ অপরাধের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ঝুলছে। তাঁকে ধরিয়ে দেবার জন্যে ভারত সরকার দু'হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। এহেন গোপেশচন্দ্র আমার কাছে নিশ্চিন্ত আরামে প্রকাশ্য দিবালোকে ছাপাখানার ভিতরে ব'সে গল্পগুজব করছেন, এমন সময় একজন কনস্টেবল এসে আমাকে একটুকরো কাগজ দিল। তাতে প্রভাত-দা লিখেছেন, 'আজ সন্ধ্যায় একটু গান শোনাবে ভাই! রাত্রির আহারটাও আমার এখানেই।'

গোপেশচন্দ্রকে ছেড়ে আমার যাওয়া অসম্ভব। উত্তরে প্রভাত-দা'কে লিখে পাঠালাম, 'আজ একজন বন্ধু আমার অতিথি। আজ যাওয়া সম্ভবপর নয়। ক্ষমা করবেন।'

কিছুক্ষণ পরে আবার কনস্টেবলটির আবির্ভাব।

এবারে প্রভাত-দা লিখেছেন, 'তোমার বন্ধুরও নিমন্ত্রণ রইলো আমার বাড়ীতে। তিনিও রাত্রে এখানেই খাবেন। তাঁকে সঙ্গে ক'রেই নিয়ে এসো। বড় ব্যস্ত আছি ব'লে নিজে গিয়ে তোমার বন্ধুকে নিমন্ত্রণ ক'রে আসতে পারলাম না।'

গোপেশচন্দ্রকে চিট্‌টুকু দেখালাম। একটু হেসে তিনি বললেন, 'যাওয়াই যাক্ না।'

সম্মতিসূচক উত্তর নিয়ে কনস্টেবলটি চ'লে গেল। গোপেশচন্দ্র বেশ উৎসাহিত হ'য়ে বললেন, 'মন্দ কি, একটা এক্সপিরিয়েন্স তো।'

সন্ধ্যার পরে দুই বন্ধুতে মিলে থানায় গেলাম। প্রভাত-দা

বিশেষ সম্মানের সঙ্গে গোপেশচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করলেন। গোপেশ-চন্দ্রের চালে-চলনে কথাবার্তায় জড়তা নেই, আড়ষ্টতা নেই, কোনরূপ সঙ্কোচ নেই—সদা-সপ্রতিভ। গোপেশচন্দ্রের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা ক'য়ে প্রভাত-দা মুগ্ধ হলেন। অতঃপর গানের আসর বসলো। দশ-বারোটি শ্রোতা। প্রায় দুটি ঘণ্টা আমি গাইলাম। বোধহয় গোপেশচন্দ্রও এই প্রথম আমার গানের আসরে যোগ দিলেন। গানের আসরের পর ভোজন-পর্ব। ভূরি-ভোজনের পর বাঘের ঘর থেকে বেরিয়ে ঘোষ্ মহাশয় আমার সঙ্গে ছাপাখানা অভিমুখে চললেন।

আমি রয়েছি আমার পল্লীবাস-ভূমে। অকস্মাৎ একদিন প্রভাত-দা'র চিঠি এল। তিনি লিখছেন, 'গবর্নর আসছেন জঙ্গিপুরে। তুমি পত্রপাঠ মাত্র চলে এস।'

লাটসাহেবের দরবারে যে আমার গান হবে না, তা জানি। তবু প্রভাত-দা'র আহ্বানের কারণটা বুঝতে পারলাম না। যাই হোক, বাড়ী থেকে রওনা হ'য়ে এলাম জঙ্গিপুরে। প্রভাত-দা বললেন, 'লাটসাহেবের আগমন উপলক্ষে সমগ্র জেলার যে সব পুলিশ অফিসারেরা আসবেন, তাঁদের আনন্দ দিয়ে একটু তোয়াজ করতে হবে ভাই!'

বিপ্লবীর কার্য বটে! অপেক্ষা করতে লাগলাম, লাটসাহেবের আসার দিনটির। যে দিন লাটসাহেব আসবেন, তার আগের দিনে সন্ধ্যার সময় প্রভাত-দা'র সঙ্গে ব'সে গল্প করছি, এমন সময় আশু বাঁড়ুজ্যের আবির্ভাব। আশুবাবু হচ্ছেন, সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলার

রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের ভাগ্যবিধাতা—আই. বি. অফিসার—রাজনৈতিক গোয়েন্দা। লাটসাহেব আসবার আগে তাঁর উদয়ের কারণ এই যে, তিনি শহরের রাজনৈতিক আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করবেন। তাঁর গুপ্ত সংবাদদাতাদের কাছ থেকে জানবেন, শহরে কোনো গোপন ষড়যন্ত্র চলছে কি না;—রাজনৈতিক সন্দেহভাজনদের গতিবিধিরও খোঁজ-খবর নেবেন। হঠাৎ আমাকে দেখে আশুবাবু চমকে, উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি যে!'

'কেন আমাকে কি আসতে নেই? লাটসাহেব দেখতে এসেছি। আপনার আপত্তি থাকে তো বলুন, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই।'

প্রভাত-দা'র কল্যাণে পুলিশের বহু অনুষ্ঠানে আমি আশুবাবুর সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ করেছি। আশুবাবু হেসে কথা কন। সে হাসির অর্থ অত্যন্ত স্পষ্টরূপে আমার কাছে ব্যক্ত হ'য়ে পড়ে। অনেক বার তাঁর সহকর্মীদের সম্মুখে ব্যঙ্গচ্ছলে তাঁকে এমন সব কথা বলেছি যাতে তাঁর মাথা হেঁট হ'য়ে গেছে। হয়তো তাঁর প্রতিশোধ-স্পৃহাও জেগেছে, কিন্তু প্রভাত-দা'র প্রভাবে তিনি আমার কোনও ক্ষতি করতে পারেন নি।

আমাদের বাক্যালাপে বাধা দিয়ে প্রভাত-দা আশুবাবুকে বললেন, 'তোমাদের একটু আনন্দ দেবার জন্যেই নলিনীকে আনিয়েছি।'

আশুবাবু 'বেশ তো, বেশ তো' ক'রে ভদ্রতা রক্ষা করলেন।

আশুবাবুর সঙ্গে প্রভাত-দা'র নানা বিষয়ে আলোচনা চলেছে। আমি একখানি চেয়ারে ব'সে সে সব শুনছি। এইরূপে কিছুক্ষণ কাটবার পর প্রভাত-দা আমাকে বললেন, 'নলিনী, তুমি একটু বেড়িয়ে এস না ভাই, আশুর সঙ্গে আমার একটু গোপনীয় কথা আছে।'

ঘর থেকে আমি বেরিয়ে সত্যিই বেড়াতে বেরোলাম। পুলিশের গোপন কথা, ও কি শিগগির শেষ হবে? প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে রাত্রি ন'টার সময় আমি প্রত্যাবর্তন করলাম। দেখি, প্রভাত-দা আমারই অপেক্ষায় একলাটি ব'সে আছেন তাঁর অফিস-ঘরে। আমাকে দেখে বললেন, 'এত দেরি করলে যে? আমাদের কথা তো এক মিনিটেই হ'য়ে গেছে। শুনবে, কী কথা হ'লো?'

আমি বললাম, 'পুলিশের গোপন-কথা, ও শুনে আমার কাজ নেই।'

প্রভাত-দা' বললেন, 'শোনো, তোমার সম্বন্ধেই কথা। আশুকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার সঙ্গে তার এক ঘরে শুতে আপত্তি আছে কি না। আমি তো জানি, আশু তোমাকে কী দৃষ্টিতে ছাখে। কিন্তু আশু তো আপত্তি করলে না,—সম্মতিই জানালে।'

প্রভাত-দা'কে বললাম, 'অমূলক সন্দেহটি চ'লে গেছে বোধ হয়।'

প্রভাত-দা বললেন, 'নাও, এখন খাবে চলো। আশু এইমাত্র খেয়ে-দেয়ে শুতে গেল।'

প্রভাত-দা অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে আমাকে বললেন, 'ঐ ঘরটিতে তোমাদের শোবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

খাওয়া-দাওয়া সেরে সেই ঘরটিতে ঢুকলাম। দেখি, প্রকাণ্ড একটি কক্ষ। সাত-আটখানি তক্তাপোশ জুড়ে শতরঞ্চি-চাদর দিয়ে ফরাস পাতা হয়েছে। মাথার দিকে অনেকগুলি বালিশ। সেই ফরাসের এক প্রান্তে আশুবাবু শয্যাগ্রহণ করেছেন। ঘরের ভিতরে একটি ক্ষীণদীপ্তি হ্যারিকেন লণ্ঠন চিমনির সর্বাঙ্গ কালিমণ্ডিত ক'রে যেন ধুঁকছে। ঘরে ঢুকেই আমি বললাম, 'আশুবাবু, ঘুমুলেন নাকি?'

আশুবাবু জেগেই ছিলেন। বললেন, 'না মশায়, ঘুম কি হবে? যা গরম পড়েছে। এরা একখানা হাত-পাখারও ব্যবস্থা করেনি!'

আমি শুয়ে পড়লাম ফরাসের অপর প্রান্তে। আশুবাবু আর আমার মধ্যে পাঁচ-ছ'খানা তক্তাপোশের ব্যবধান। জামাটি খুলে রেখে গেঞ্জি গায়ে শুয়ে পড়েছি। কিছুক্ষণ পরে গেঞ্জিটি ঘর্মাক্ত হ'য়ে পড়লো। সেটিকে খুলে ফেলবার জন্যে বিছানা থেকে উঠে বসেছি, দেখি ও-প্রান্ত থেকে আশুবাবুও উঠে বসেছেন! গেঞ্জিটি খুলে রেখে শুয়ে পড়লাম, দেখি আশুবাবুও শুয়ে পড়েছেন। শুয়ে শুয়ে মাথায় একটি দুশ্চিন্তা এল: তাইতো, আমার ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আশুবাবু উঠলেন কেন? তাই তো!—আমার ওঠার সঙ্গে তাঁর ওঠার কোনো যোগাযোগ আছে কিনা, পরীক্ষা করবার জন্যে আমি প্রায় আধ ঘণ্টা পরে অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে উঠে বসলাম। ওমা, ওদিকে আশুবাবুও উঠে বসেছেন! বললাম, 'কি আশুবাবু, ঘুম হচ্ছে না?'

'না মশায়, বড্ড মশা!'

আমি তক্তাপোশ থেকে নেমে আড়চোখে আশুবাবুকে দেখতে দেখতে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে একটু পায়চারি ক'রে ঘুরে এসে আবার শয্যাশায়ী হলাম। আশুবাবু ততক্ষণ বিছানার ওপর ব'সেই ছিলেন! আমি শোবার পর শয্যাগ্রহণ করলেন তিনি। আমার দুশ্চিন্তা আর গেল না। ঘুম চুলোয় গেল, কেবলই মনে হয়, আর-একবার উঠবো নাকি? ঘুম কিছুতেই আসে না। মাথায় নানা রকম দুর্বুদ্ধি জাগে। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আবার উঠে বসলাম। আশুবাবুর মাথার কাছে একটি গ্লাডস্টোন ব্যাগ ছিল। সেই নির্বাণোন্মুখ লণ্ঠনের স্তিমিত আলোকে দেখি, আশুবাবু সেই ব্যাগটি তাঁর কোলের কাছে টেনে এনে তার ভিতর থেকে কী-একটা বস্তু বের করলেন। রিভলবার নাকি? হবেও বা।

সেই বৃহদায়তন কক্ষটির চতুষ্পার্শ্বে দশ-বারোটি জানালা ছিল।

সবগুলিই খোলা। আমি একে একে জানালাগুলি বন্ধ ক'রে চলেছি। আশুবাবুর মাথার কাছেই একটি জানালা। যখন সেটি বন্ধ করতে উদ্যত হয়েছি, তখন আশুবাবু উঠে ব'সে একটু উত্তেজিত হ'য়ে আমাকে বললেন, 'ও কী হচ্ছে মশায় ?'

তাঁর দিকে দৃক্‌পাত না ক'রে আমি বললাম, 'জানালা বন্ধ করছি।'

'এই দারুণ গরমে জানালা খুলে রেখেই ঘরে টেকা যায় না; আপনি আবার তার ওপর জানালাগুলি বন্ধ ক'রে দিচ্ছেন! মাথা খারাপ হ'লো নাকি আপনার ?'

তাঁর মাথার কাছের জানালাটি সশব্দে বন্ধ ক'রে দিয়ে অন্য

জানালার কাছে যাবার সময় বললাম, 'মাথা ঠিক আছে ব'লেই বন্ধ করছি মশায়!'

আমি অন্য জানালা বন্ধ করছি, এমন সময়ে আশুবাবু তাঁর মাথার কাছের জানালাটি আবার খুলে দিলেন। আমি একে একে সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ ক'রে দিয়ে আবার আশুবাবুর মাথার কাছে গেলাম সেই জানালাটি বন্ধ করতে। আশুবাবু বললেন, 'আবার বন্ধ করছেন? আচ্ছা লোক তো আপনি! আপনার উদ্দেশ্য কি বলতে পারেন?'

জানালাটি বন্ধ ক'রে আশুবাবুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁকে বললাম, 'উদ্দেশ্য মহৎ।'

'কী?'

আমি পাল্‌টা প্রশ্ন করলাম তাঁকে, 'আশুবাবু, বিপ্লবীদের পেছনে লাগা আপনার পেশা,—আজকে আপনার পেছনে যে কেউ লাগেনি, তা কি আপনি জোর ক'রে বলতে পারেন?'

আশুবাবু গম্ভীর হ'য়ে বললেন, 'দেখতেই তো পাচ্ছি, আপনি লেগেছেন।'

আমি বললাম, 'আমি তো মশায়, দুটো গান গাই, একটু তব্‌লার ওপর চাঁটি মারি—আমি সামান্য জীব; আমি আর আপনার পেছনে কী লাগবো। আমি বলছি, তাদের কথা, যাদের প্রাণদণ্ডের কারণ হয়েছেন আপনি; তাদের দলের লোক যে আপনার প্রাণদণ্ডের জন্য আজ পিছু নেয়নি, একথা বলতে পারেন?'

আশুবাবু একেবারে ভয়চকিতস্বরে ব'লে উঠলেন, 'কে পিছু নিয়েছে?'

আমি বললাম, 'কে পিছু নিয়েছে, তা আমি কি ক'রে ব'লবো? আমার কথা—প্রতিশোধ-পরবশ হ'য়ে তারা পিছু নিতেও পারে তো? আপনি শুয়ে থাকবেন, আর বাইরে থেকে কেউ জানালার ফাঁক দিয়ে

গুলী দেগে আপনার দফা নিকেশ করবে, তারপরে হাতকড়ি পড়বে আমার হাতে! বাইরে থেকে কে আপনাকে মেরে ফেলবে, আর ফাঁসি পড়বে আমার গলায়! ওর মধ্যে আমি নেই মশায়, আপনি মরুন আর বাঁচুন, তাতে আমার কিছু যায়-আসে না, আমাকে আত্মরক্ষা করতে হবে তো।'

আশুবাবু মিনতি ক'রে আমাকে বললেন, 'না মশায়, দয়া ক'রে জানালাগুলি খুলে দিন। এ রকম গরমে সিদ্ধ হ'য়ে মরার চেয়ে পিস্তলের গুলীতে মরা ঢের ভালো।'

কিছুতেই না। সারারাত্রি দু'জনে তর্কাতর্কি, রাগারাগি, ঝগড়া-ঝাঁটি চললো সেই বদ্ধ ঘরের গুমোটের মধ্যে।

পরদিন প্রভাতে প্রভাত-দা সমস্ত বিবরণ শুনে হাসতে হাসতে আশুবাবুকে বললেন, 'সকালে সকালে স্নান ক'রে দিনের বেলা একটু ঘুমিয়ে নাওগে।'

এই প্রভাত-দা'ই কিনা অবশেষে আমাকে গ্রেপ্তার করলেন! জঙ্গিপুরের কাছাকাছি একটি গ্রামের একজন বন্ধুর বিয়ে দিতে শেওড়াফুলি গেছি। বর-বৌ নিয়ে ফুর্তি করতে করতে ভোরের ট্রেনে আমরা নামলাম জঙ্গিপুর রোড স্টেশনে। যেই নামা, অমনি একজন কনস্টেবল আমাকে পাকড়াও করলে প্ল্যাটফর্মের ওপরেই। ঠিক বেড়ালে যেমন ইঁদুর ধরে। বেচারা বরযাত্রীর দল আশা করেছিল আমাকে নিয়ে কত আনন্দ করবে ব'লে। তা আর হ'লো না। সটান গিয়ে নীত হলাম থানায়। থানার গায়েই প্রভাত-দা'র বাসা। কনস্টেবলটি উচ্চস্বরে আমার গ্রেপ্তারবার্তা তার ইনস্পেক্টর-সাহেবকে

নিবেদন করলে। প্রভাত-দা জেগেই ছিলেন। তিনি তাঁর শয়ন-কক্ষের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কনস্টেবলটিকে বললেন, 'এখন গারদে আটক ক'রে রাখো। সকালে আমি দেখবো।'

আমি বিস্ময়ে অবাক্! গ্রেপ্তার হবার জন্যে নয়—প্রভাত-দা'র ব্যবহারে। গ্রেপ্তার যে এতদিন হইনি, এইটেই আশ্চর্যের বিষয়। কিন্তু প্রভাত-দা একটি কথাও কইলেন না আমার উদ্দেশে। একেই বলে পুলিশ। প্রভাত-দা'কে পুলিশের মধ্যে ব্যতিক্রম ভেবে এতদিন ভুলই করেছিলাম। এই রকম সাত-পাঁচ ভাবছি। কনস্টেবলটি হাজত-ঘরে আমাকে পোরবার জন্যে বোধহয় তালাচাবি খুঁজছে, এমন সময় খড়ম পায়ে, থেলো হুঁকোয় তামাক খেতে খেতে প্রভাত-দা নেমে এলেন থানার অফিস-ঘরে। গম্ভীর মুখ, কুঞ্চিত ভ্রূ, সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। হায়রে, এই মানুষের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল! পুলিশের স্বরূপ যেন প্রভাত-দা'র অন্তর ভেদ ক'রে সর্বাঙ্গে ফুটে বেরুচ্ছে। আমিই আগে কথা বললাম, 'ব্যাপার কি?'

নিতান্ত ভালোমানুষের ভঙ্গিতে তিনি বললেন, 'কিছুই জানিনে ভাই। বহরমপুর থেকে হুকুম এসেছে তোমাকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যাবার জন্যে। আমি কেবল উপরওয়ালার হুকুম তামিল ক'রেছি। তোমার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আসার পর খোঁজ নিয়ে জানলাম, তুমি শেওড়াফুলি গেছ, এই ট্রেনেই ফিরবে। বড় দুঃখের বিষয় যে, এই অপ্রিয় কাজটি আমাকেই করতে হ'লো। কিছু মনে ক'রো না ভাই, আমি উপরওয়ালার আজ্ঞাবাহী মাত্র।'

আমি বললাম, 'আমার বিরুদ্ধে চার্জ কী?'

প্রভাত-দা বললেন, 'কনস্পিরেসির চার্জ, ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ রাজত্ব উচ্ছেদের চার্জ, ডাকাতির চার্জ, আরও যে কি কি চার্জ আছে,

সবগুলো আমার স্মরণে নেই। যাক্, সেটা বহরমপুরে গিয়ে যথাস্থানে জানতে পারবে।'

আমি নীরবে তাঁর কথা শুনতে লাগলাম। প্রভাত-দা বললেন, 'হাঁ, আর একটি কথা। সকাল ন'টায় ট্রেন। আমরা দুটি ভাতে-ভাত খেয়েই রওনা হবো, তুমিও স্নানটান সেরে দুটি খেয়ে নেবে আমার সঙ্গে। কেমন?'

থানায় এসে অবধি প্রভাত-দা'র ওপর আমার মন বিরূপ হ'য়েই আছে। তাঁকে স্পষ্ট বললাম, 'খাওয়া-দাওয়ায় আমার দরকার নেই। কি হবে খেয়ে?'

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে প্রভাত-দা ব'লে উঠলেন, 'সর্বনাশ, তুমি আমার গৃহবিবাদ বাধিয়ে দেবে দেখছি। তুমি না-খেলে তোমার বৌদি

যে আমায় খেয়ে ফেলবে! সে হ'তেই পারে না। চাকরির দায়ে আজ তোমাকে গ্রেপ্তার ক'রেছি ব'লে এতদিনের বন্ধুত্বটা উবে যাবে?'

ভালো লাগছিল না প্রভাত-দা'র কথাগুলো। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বললাম, 'আর বন্ধুত্বের কথাটা তুলবেন না। বৌদি যদি রাগ করেন, খাবো।'

বৌদি ছিলেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। তাঁর ঐকান্তিক স্নেহকে অবজ্ঞা ও অসম্মান করলে আমার অপরাধ হ'তো।

স্নানাহার সেরে সকাল ন'টার গাড়ীতে আমরা রওনা হলাম বহরমপুর অভিমুখে। সঙ্গে দু'জন সিপাহীও চললো। প্রভাত-দা বললেন, 'ভায়া, মনে হচ্ছে তুমি আমার ওপর চটেছো। কিন্তু কি ক'রবো ভাই, চাকরি বজায় রাখতে হবে তো? তবে তোমার প্রতি যতটা কর্তব্যপালন করা উচিত, তা আমি করেছি। যে-সব চার্জ তোমার ওপর রয়েছে, সে-সব চার্জের অপরাধীকে কোমরে দড়ি বেঁধে, হাতে হাতকড়ি পরিয়ে নিয়ে যেতে হয়। আমি সে-সব কিছুই করিনি। কারণ, আমার বিশ্বাস আছে তোমার ওপর,—পালিয়ে গিয়ে তুমি আমাকে বিপন্ন করবে না। সিপাহী দুটোকেও থার্ড ক্লাসে বসিয়ে সাধারণ ভদ্রলোকের মতো আমরা চলেছি ইণ্টার-ক্লাসে। এর বেশি আর কি করতে পারি ভাই?'

জঙ্গিপুর রোড ছাড়িয়ে কয়েকটি স্টেশন পরে আমাদের ট্রেন এলো আজিমগঞ্জ জংশন স্টেশনে। স্টেশনে ট্রেনখানি প্রবেশ করছে ধীর-মন্থর গতিতে; চেয়ে দেখি দশ-বারোজন পুলিশ কর্মচারী প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে। স্পষ্ট শুনতে পেলাম, আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে একজন পুলিশ-কর্মচারী বললো, 'ঐ যে নলিনী সরকার—।'

আজিমগঞ্জ জংশন স্টেশনে ট্রেন থামা মাত্র প্রভাত-দা গাড়ী থেকে

নেমে গেলেন এবং কয়েক মিনিট পরে আমার কক্ষে ফিরে এলেন সেই সব পুলিশ কর্মচারীদের সঙ্গে নিয়ে।

ট্রেন ছেড়ে দিল। আরম্ভ হ'লো অভিমন্যুবধের পালা। সবক'টি পুলিশ-অফিসার জেরায় জেরায় আমাকে উত্ত্যক্ত ক'রে তুললো।

দেশে যতগুলো পুলিশ খুন হয়েছে, যত জায়গায় বোমা প'ড়েছে, যত রাজনৈতিক ডাকাতি হয়েছে,—সবগুলোর সঙ্গেই যেন আমি জড়িত; যেন সমস্ত নামকরা বিপ্লবীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সংযোগ!

ট্রেন এসে পৌছলো খাগড়া ঘাট স্টেশনে। এইখানে নেমে প্রায় ডজনখানেক পুলিশ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে, খেয়ায় ভাগীরথী পেরিয়ে পৌছলাম বহরমপুরের পারে। সকলে মিলে আমাকে যেখানে নিয়ে গিয়ে তুললো, সেখানে দেখি শতাধিক পুলিশ সমবেত হয়েছে। একটা কিসের যেন হৈ-চৈ চলেছে।

অথচ সেটি থানা নয়, পুলিশ-ব্যারাক নয়, জেলখানাও নয়। অধিকাংশ লোকের পোশাকেও পুলিশের বৈশিষ্ট্য নেই—ভদ্রলোকের পোশাক-পরা সব। আমার সঙ্গের পুলিশেরা দিব্যি ভিড়ে গেল তাদের সঙ্গে।

আমি একখানি চেয়ারে একাকী ব'সে আছি। কোনো রক্ষী নেই, পাহারা নেই—আমি যে গ্রেপ্তারী আসামী, আমাকে যে নজরবন্দী ক'রে রাখা দরকার, তার কোনো চিহ্নই নেই।

আমি আমার ভবিষ্যৎ চিন্তায় নিমগ্ন। কিছুক্ষণ পরে বহরমপুরের একজন পরিচিত পুলিশ অফিসার আমার সমুখ দিয়ে চ'লে যাবার সময় দুটি হাত জোড় ক'রে কপালে ঠেকিয়ে আমাকে উদ্দেশ ক'রে বলতে বলতে চ'লে গেলেন—'নমস্কার। আপনি এসেছেন? বড় আনন্দ হ'লো।'

পিত্তি জ্ব'লে গেল কথা শুনে। প্রতি-নমস্কারও ক'রলাম না। মনে মনে উত্তর দিলাম—আনন্দ আর হবে না, আমরাই যে তোমাদের প্রোমোশনের উপাদান!

কিছুক্ষণ পরে প্রভাত-দা এলেন, পিছনে একটি সেপাই। সেপাইটির একহাতে এক রেকাবী মিষ্টান্ন—অন্য হাতে এক গ্লাস জল। মৃদুহাসি মুখে মেখে প্রভাত-দা বললেন, 'একটু জলখাবার খেয়ে নাও ভাই! কোন সকালে খেয়েছো।'

সত্যিই ক্ষিদের উদ্রেক হয়েছিল। সেপাইটি আমার সামনে একটি চেয়ারের ওপর খাবার ও জল রেখে চ'লে গেল। পাশের চেয়ারে ব'সে পড়লেন প্রভাত-দা।

'এটা খাও, ওটা খাও' ব'লে প্রভাত-দা আমাকে আপ্যায়িত করছেন। আপ্যায়নটি আদৌ ভালো লাগছে না ব'লে আহারেও

যেন আমি তৃপ্তি পাচ্ছিনে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এটা কি ? কি হচ্ছে এখানে ?'

প্রভাত-দা বললেন, 'এটা আমাদের পুলিশ-ক্লাব। আপাততঃ এইখানেই তোমাকে নিয়ে এসেছি। বিশ্রাম ক'রে একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে নাও, তারপরে যেখানে নিয়ে যাবার কথা, সেখানে নিয়ে যাবো। শোবে একটু ? ভেতরের ঘরে শোবার ব্যবস্থা আছে। শুতে চাও তো বলো, তোমাকে সব দেখিয়ে দিয়ে আসি।'

আমি বিরক্ত হ'য়েই বললাম, 'থাক্, আর শুয়ে কাজ নেই। যেখানে যেতে হবে সেখানে এখুনি নিয়ে চলুন না ?'

প্রভাত-দা বললেন, 'সেটা তো তোমার-আমার মর্জির ওপর নির্ভর করে না, তার জন্যে সময় ঠিক করা আছে, বিকেল পাঁচটা। আগে যাই কি ক'রে বলো ? তাই বলছিলাম, এখনও দু'তিন ঘণ্টা সময় বাকি, ইচ্ছা করলে একটু ঘুমিয়েও নিতে পারো।'

এবারে আমি প্রভাত-দা'কে মুখ ফুটে স্পষ্টই বললাম, 'সব সময় ঠাট্টা-রহস্য ভালো লাগে না, প্রভাত-দা !'

প্রভাত-দা হাসতে হাসতে বললেন, 'তোমার মুখে এই কথা ? কিন্তু এটা ঠাট্টা-রহস্য তুমি বুঝলে কি ক'রে ?'

'এটা বোঝার মতো বুদ্ধি আমার আছে।'

প্রভাত-দা কণ্ঠে জোর দিয়ে বললেন, 'ঘোড়ার ডিম আছে। ও-বুদ্ধির আর বড়াই কোরো না। সত্যিই যদি শুতে চাও তো চলো।'

আমি গেলাম না এবং নীরব রইলাম। প্রভাত-দা আবার বললেন, 'চলো চলো, একটু ভালো ক'রে হাত-পা ছড়িয়ে জিরিয়ে নাও। অনেক সময় আছে এখনও ; বিকেল পাঁচটায় মিটিং।'

'মিটিং? কিসের মিটিং?'

মুচকি হাসি হেসে প্রভাত-দা বললেন, 'আজ আমাদের পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ফেয়ারওয়েল যে।'

আমি বললাম, 'তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি!'

প্রভাত-দা বললেন, 'সেই মিটিং-এ তোমাকে গাইতে হবে যে।'

'মানে?'

প্রভাত-দা বললেন, 'মানে আর কিছু নয়। সবটা শোনো, তাহ'লেই বুঝতে পারবে। পরশু চিঠি পেলাম, এই ফেয়ারওয়েল মিটিং-এ তোমার গানের ব্যবস্থা করতে হবে। শুনলাম, তুমি বরযাত্রী হ'য়ে শেওড়াফুলি গেছ। ফিরবে আজ ভোরের ট্রেনে। বরযাত্রীর দল তোমাকে কিছুতেই ছাড়বে না, আর তুমিও তাদের অনুরোধ এড়াতে পারবে না—এই সব নানা রকম ভেবে মাথায় মতলব আঁটলাম, তোমাকে অ্যারেস্ট ক'রে নিয়ে যাব।'

'বলেন কি?'

প্রভাত-দা বললেন, 'একটু আগে বড় বুদ্ধির বড়াই করছিলে? সেটা ঘুচলো?'

আমি হতভম্ব। প্রভাত-দা বললেন, 'তোমাকে একটা কনস্টেবল গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে এল স্টেশন থেকে—আর তুমি সোনারচাঁদ ছেলের মতো সুড় সুড় ক'রে তার সঙ্গে থানায় চ'লে এলে! গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্টটাও দেখতে চাইলে না?'

'তাইতো!'

শেষ কথা

আমার কথাটি ফুরোলো। এইবারের এই কথাই আমার শেষ কথা। হয়তো এইটেই গোড়াকার কথা হওয়া উচিত ছিল। অবশ্য গোড়াতে আমার এ-কথার একটু আভাস দিয়েছিলাম।

গুরুবাক্য লঙ্ঘন করা যে মহাপাপ, তা প্রথমেই বলেছি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন সঙ্গীতকে উপজীবিকারূপে গ্রহণ করতে। তিনি ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। আমার অদূরভবিষ্যৎ তাঁর ঋষি-দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছিল ব'লেই তিনি আমাকে সময় থাকতে সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সে-কথা আমি শুনিনি। অবশেষে জীবন-যাত্রার শকটখানি যেদিন একেবারেই অচল হ'য়ে পড়লো, সেইদিনে বন্ধুবর দিলীপকুমার রায়ের নির্দেশে হাসির গানকে পেশারূপে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলাম।

ঠিক তার অব্যবহিত পূর্বমুহূর্তের কথাটি ব'লে আমি বিদায় নেব। অবশ্য এটা হাসির কথা নয়,—হাসির অন্তরালের কথা—আমার অন্তরতম প্রদেশের গোপনতম কথা। যে-কথা মৃত্যু-মিলন-অভিসারিকা শ্রীরাধার কণ্ঠে গীত হয়েছিল, 'মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান'—সেই মিলন-মহাযাত্রার কথা।

ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর আগেকার ঘটনা। সাংবাদিক-বৃত্তি অবলম্বন ক'রে জীবনযাপন করি, আর কলকাতা শহরের নানান জায়গায় শখের গান গেয়ে হাততালি কুড়িয়ে নিয়ে বাড়ী ফিরি। দিলীপকুমার রায় তখন বিলেত থেকে ফিরে গান গেয়ে গেয়ে কলকাতায় খুবই

জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছেন। বহু গানের আসরে দিলীপকুমার ও আমি দু'জনেই গেয়েছি। দিলীপকুমারের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে আমি মুগ্ধ হয়েছি, আমার গাওয়া হাসির গান তিনিও উপভোগ করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সম্পূর্ণ সুযোগ ও সুবিধা সত্ত্বেও পরস্পরের সঙ্গে আলাপ হ'লো না,—বাক্যালাপও নয়। হয়তো আলাপের জন্যে দু'জনের কারও কোনোরূপ আগ্রহ ছিল না।

দিন যায়, দিন আসে। এই যাতায়াতের মধ্যে একটি অনবহিত মুহূর্তে অকস্মাৎ দারুণ দুর্দিন এসে উপস্থিত হ'লো। হঠাৎ একদিন বেকার হ'য়ে পড়লাম। অতি সামান্য অর্থ সঞ্চিত ছিল;—তা নিঃশেষিত হ'তে বড় বেশী বিলম্ব হ'লো না। অত্যন্ত হিসেব ক'রে চ'লে কিছুদিন কাটিয়ে একদা নয়ন বিস্ফারিত ক'রে দেখলাম, মাত্র দুটি পয়সা জীবনধারণের জন্যে অবশিষ্ট আছে। ঐ দুটি পয়সা সম্বল ক'রে বেরিয়ে পড়লাম কলকাতার জনসমাকীর্ণ রাজপথে। কোথায় যাই? সঙ্গে একটি মাত্র হ্যাণ্ড-ব্যাগ। তার ভেতরে দু'চারখানা জামা-কাপড়। সেটিকে রেখে এলাম শিয়ালদহে এক বন্ধুর মেসে।

আবার পথের মানুষ, পথের মানুষের সঙ্গে মিশে গেলাম। সকালটা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল। নিজের খেয়ালে ঘুরছি,—উদ্দেশ্যহীন, লক্ষ্যহীন, গন্তব্যহীন। হঠাৎ সূর্যদেব মাথার ওপরে উঠে নির্মম কশাঘাতে জানিয়ে দিলেন আমার নিয়মিত আহারের নির্দিষ্ট সময়টির কথা। তখনকার দিনে কলকাতা শহরের বিভিন্ন পল্লীতে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর অভাব ছিল না। সচ্ছল অবস্থার দিনে তাদের গৃহে সময়ে-অসময়ে উপস্থিত হ'য়ে জোর ক'রে আবদার ধ'রে খাবার আদায় ক'রেছি, আজ অচল অবস্থায় আত্মমর্যাদাবোধ যেন মাথা-চাড়া দিয়ে উঠলো। কিছুতেই প্রাণ চাইলো না যে, কোনো বন্ধুর শরণাপন্ন হই। বরং

বন্ধুদের কাছে নিজের অবস্থা সম্পূর্ণভাবে গোপন ক'রেই চলতে লাগলাম।

আত্মমর্যাদাবোধ মানুষকে হয়তো একটু চাঙ্গা ক'রে রাখতে পারে, কিন্তু তার উদরের ক্ষুধার নিবৃত্তি করতে পারে না। ক্ষুধার প্রকোপ ক্রমশঃ বেড়েই চললো। সঙ্গের সম্বল দুটি পয়সার সদ্ব্যবহার করবার জন্যে একটি যোগ্য স্থান খুঁজতে লাগলাম—যেখানে কোনো পরিচিত লোকের দেখা না মেলে। এইরূপ স্থানের সন্ধান করতে করতে কলকাতা শহরের উপান্তে খালধারে গিয়ে পৌঁছলাম। এখানে আমার পরিচিত কোনো লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া মোটেই সম্ভবপর নয়। খালধারের একটি পশ্চিমার দোকান থেকে কিনলাম দু'পয়সার ছোলা-ভাজা। সেই ছোলা-ভাজা খাওয়ার পর উদরের শূন্য অংশ পথিপার্শ্বস্থ কলের জল দিয়ে পূর্ণ ক'রে অনির্দিষ্টের পথে আবার হ'লো আমার যাত্রা শুরু।

সারাদিন এখানে-সেখানে ঘুরে সন্ধ্যার পরে গিয়ে উঠলাম ওল্ড ক্লাবে। বৌবাজার স্ট্রীট ও ওয়েলিংটন স্ট্রীটের চৌমাথার মোড়ে ছিল এই ওল্ড ক্লাব। সেকালে ওল্ড ক্লাব কলকাতা শহরের একটি সুবিখ্যাত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছিল। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী-প্রমুখ বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি ওল্ড ক্লাবে প্রায় প্রত্যহ যোগদান করতেন। আমারও যাতায়াত ছিল এখানে। এই ওল্ড ক্লাবে রাত্রিটা যাপন ক'রে আবার পথচারী হ'তে নিরুদ্দেশ-যাত্রায় বেরিয়ে পড়লাম।

সেকালে সাহিত্যিকদের একটি বড় আড্ডা ছিল 'ভারতী' অফিসে। বন্ধুবর মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন 'ভারতী'র কর্ণধার। তাঁরই ছাপাখানা কান্তিক প্রেসে 'ভারতী' ছাপা হ'তো। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিজাকুমার বসু, সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়,

কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শিল্পী চারুচন্দ্র রায়, জ্যোতিষী হরিদাস গাঙ্গুলী প্রভৃতি নিয়মিত আসতেন 'ভারতী'র আড্ডায়। নিয়মিত আগন্তুকদের মধ্যে আমিও ছিলাম একজন আড্ডাধারী।

ওল্ড ক্লাব থেকে বেরিয়ে ক্ষুৎকাতর দেহে মর্নিং ওয়াক করতে করতে সুকিয়া স্ট্রীটে (এখন কৈলাস বসু স্ট্রীট) কান্তিক প্রেসের উপরতলায় 'ভারতী'র আড্ডায় এসে উঠলাম। এই সকালকার আড্ডায় মণিলাল সমবেত বন্ধুদের চা ও ধূমপানে আপ্যায়িত করতেন। এখানে এসে খালি-পেটে এক পেয়ালা চা খেয়ে প্রাণটা জুড়োলো। সকলের সঙ্গে বেলা বারোটা পর্যন্ত আড্ডা দিলাম। আড্ডার পরে সকলে যে-যার বাড়ী চ'লে গেল মধ্যাহ্নভোজনাদি করতে। আমিও সকলের সঙ্গে বেরিয়ে কিছুক্ষণ রাস্তায় ঘুরে আবার 'ভারতী'র আড্ডা-ঘরে ফিরে এসে, একটি তাকিয়ার ওপর মাথা দিয়ে ফরাসের ওপর অবসন্ন দেহ এলিয়ে দিলাম। অন্নপূর্ণা কৃপা না করলেও সর্বসন্তাপহরা সুপ্তি দেবী এসে আদর ক'রে তাঁর স্নেহময় ক্রোড়ে তুলে নিলেন। অপরাহ্ণে আবার পথে; রাত্রে আবার ওল্ড ক্লাব। দ্বিতীয় দিনটি চায়ের ওপরেই কাটলো।

তৃতীয় দিনে নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস! সেদিন ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে আমার হাসির গান। প্রায় সপ্তাহকাল পূর্বে অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের অনুরোধে এই আসরে গাইবার জন্যে অঙ্গীকারবদ্ধ হ'য়ে আছি। এদিনেও সকালবেলায় 'ভারতী'র আড্ডার একপেয়ালা চায়ের শক্তিতে শক্তিমান হ'য়ে সন্ধ্যায় গেলাম ইউভার্সিটি ইনস্টিটিউটে হাসির গান গাইবার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে। সেখানকার অনুষ্ঠান-সূচীতে

দেখলাম, কলকাতার অনেকগুলি জনপ্রিয় গায়ক-গায়িকা এ আসরে যোগদান করবেন; দিলীপকুমার রায়ের নামও দেখলাম তালিকার মধ্যে।

অনুষ্ঠানের অধিবেশন আরম্ভ হ'লো। পর পর কয়েকজন গায়ক-গায়িকার গান হ'য়ে যাবার পর এল আমার পালা। আস্তে আস্তে মঞ্চের ওপরে গিয়ে হারমোনিয়মটি নিয়ে একটি হাসির গান গাইলাম। প্রেক্ষাগৃহ থেকে শ্রোতৃবৃন্দ করতালিধ্বনির দ্বারা আমাকে অভিনন্দিত ক'রে আর একটি গাইবার জন্যে অনুরোধ করলেন। আরও একটি গাইতে হ'লো। এবারেও শ্রোতৃবৃন্দের সমাদর থেকে বঞ্চিত হলাম না।

বহু আসরে হাসির গান গেয়েছি। খ্যাতি-অখ্যাতি, অভিনন্দন-লাঞ্ছনা উভয়বিধ উপঢৌকনই লাভ করেছি। প্রশংসা বাক্যে যে মনটা প্রসন্ন হ'য়ে ওঠে, একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু আজ যেন আদৌ প্রসন্ন হ'য়ে উঠতে পারলাম না। বরং মনটা বিদ্রোহী হ'য়ে উঠলো। আসর থেকে বেরিয়ে এসে কেবলই মনে হ'তে লাগলো, নিজের সঙ্গে এ ধাপ্পাবাজি ক'রে লাভ কি? আজ তিন দিন অনাহারে রয়েছি,—নিজের ভিতরকার আনন্দ তিলে তিলে শুকিয়ে ম'রে যাচ্ছে, আর আমি কৃত্রিম আনন্দ বিলিয়ে সারা শহরের লোকের কাছে হাততালি কুড়িয়ে বেড়াচ্ছি। জীবনেরই ওপর একটা ঘৃণা জন্মে গেল। কী হবে এ অভিনয় ক'রে? তার চেয়ে এ জীবন শেষ ক'রে দেওয়াই ভালো। সঙ্কল্প জেগে উঠলো আত্মহত্যার। মাথায় আর অন্য চিন্তা নাই, আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুবান্ধবদের কথা স্মৃতি থেকে মুছে গেল। ঘূর্ণায়মান চক্রের মতো মাথার মধ্যে কেবল একটিমাত্র চিন্তা সঞ্চালিত,—কিসে, কোন্ উপায়ে নিজেকে নিঃশেষ ক'রে দেওয়া যায়। একেই কি মনোবিজ্ঞানীরা বলেন সাময়িক উন্মত্ততা?

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের ফটকের কাছে ফুটপাতের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আত্মহত্যার উপায় উদ্ভাবন করতে লাগলাম। সকলের আগে মনের মধ্যে জেগে উঠলো আফিং-এর কথা। কিন্তু আফিং কিনতে অর্থ চাই তো? মৃত্যু-তীর্থের পাথেয়? সঙ্গে সঙ্গে সমস্যার সমাধানও হ'য়ে গেলঃ আজ অনেক সুপরিচিত ব্যক্তি এখানে এসেছেন গান শুনতে, এদের কারও কাছ থেকে একটি টাকা চেয়ে নিয়ে আফিং-এর দামটা সংগ্রহ করা যেতে পারে। কিন্তু তাতেও তো একটি দিন অপেক্ষা করতে হয়। আজ রাত্রের মধ্যে তো সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় না। মাথার মধ্যে অবিরাম এই দুশ্চিন্তার পঙ্কিল স্রোত প্রবাহের পর প্রবাহ সৃজন ক'রে তির্যক গতিতে ব'য়ে চলেছে। দুটি-একটি লোক ফটক দিয়ে বেরিয়ে এসে আমার পাশ কাটিয়ে চ'লে গেল। প্রত্যেকেই অপরিচিত। এমন সময় দেখি, দিলীপকুমার আসছেন। আমি ফটকের কাছ থেকে একটু স'রে গেলাম। দিলীপকুমার কিন্তু সটান আমার কাছে এসে, সজোরে আমার হাতের কব্‌জি চেপে ধ'রে বললেন, 'চলুন আমার সঙ্গে।'

আমার সঙ্গে দিলীপকুমারের এই প্রথম বাক্যালাপ। দুর্বল হ'য়েই ছিলাম। হাত ছাড়াবার শক্তিও নাই। বললাম, 'কোথায়?'

দিলীপকুমার বললেন, 'থিয়েটার রোডে,—যেখানে আমি থাকি। আমার মামা আর মামীমাকে আপনার হাসির গানের সম্বন্ধে কত কথা বলেছি। তাঁদের বড় ইচ্ছা, একদিন আপনার গান শোনেন। চলুন, চলুন।'

দিলীপকুমার আমাকে হিড়হিড় ক'রে টেনে এনে রাস্তার ওপারে একটি অপেক্ষমান মোটরগাড়ীর ভেতরে আমাকে বসিয়ে নিজে উঠে পাশে বসলেন।

মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মোটরগাড়ী ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটলো আমাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিতে। গাড়ীর মধ্যে ব'সে কেবল ভাবছি,—একটু আগে কোথায় যাবার সঙ্কল্প করেছিলাম, আর এখন কোথায় চলেছি! কে ধরলে আমার হাতখানি সজোরে চেপে? দিলীপকুমার?—না, দিলীপকুমারকে অবলম্বন ক'রে অন্য কেউ?

সমাপ্ত